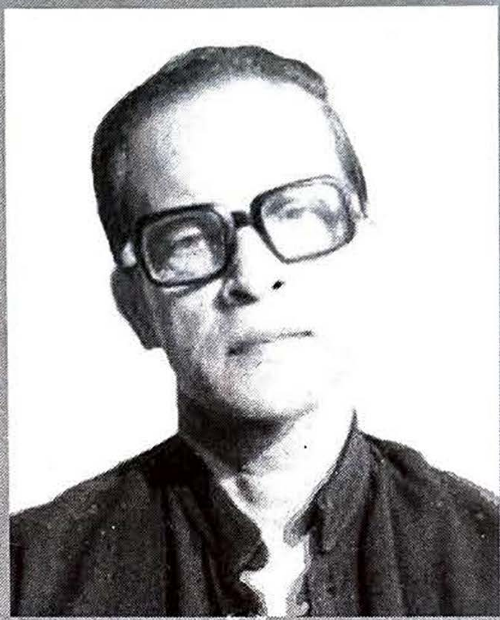


অন্য চোখে অনন্য

পীযূষ দাশগুপ্ত

অন্যচোখে অনন্য পীযূষ দাশগুপ্ত

প্রকাশক : সোহম দাশগুপ্ত
৭৫, হিন্দুস্থান পার্ক,
কোলকাতা - ৭০০ ০২৯

সত্ত্ব : সোহম দাশগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : ৩০শে জুলাই, ২০০৩

প্রচ্ছদ : রজত ঘোষ

কম্পোজ : পারফেক্ট সিসটেম

মুদ্রক : জি. পি. সাপ্লায়ার্স
১ /২, কায়স্থপাড়া থার্ড লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০৭৮

মূল্য : ৫০ টাকা

ভূমিকা

গত শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের গন্ডি পার হয়ে জেলা এবং গ্রাম স্তরে দানা বাঁধতে শুরু করে। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মুক্তিকামী মানুষ সংগঠিত হতে থাকেন ছোট ছোট দলে। এই দলগুলির অধিকাংশ সদস্য তখন বয়সে স্কুল বা কলেজের ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক বা শিক্ষকতুল্য কিছু বিপ্লবীদের নেতৃত্বে তাঁরা বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্লাব বা সমিতির পতাকার নিচে মিলিত হলেন। এই দলগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও তাঁদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিতে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য ছিল। যদিও জাতীয় স্তরে কংগ্রেসই তখন ভারতবর্ষের আপামর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মঞ্চ, তথাপি এই বিপ্লবী দলগুলির অধিকাংশই তাঁদের কর্মপদ্ধতিতে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রাধীন ছিলেন না।

তাঁদের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন শিক্ষিত এবং বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত। এক হাতে রবীন্দ্র পুস্তক আর অন্য হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাঁরা নিঃশর্ত আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত। আলোচনা আপোসের রাজনীতি চেয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথই ছিল তাঁদের কাম্য। ইতিমধ্যে ঘটে গেছে নভেম্বর বিপ্লব। দ্বিতীয় দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। তৃতীয় দশকের গোড়ায় প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'। সামান্য কালের মধ্যেই কমিউনিষ্ট মতাদর্শ যে সমস্ত ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের প্রভাবিত করেছিল, তাঁদের ব্যাক্তিত্ব, পান্ডিত্য, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ ছিল প্রশ্নাতীত। ফলে তাঁরা সহজেই যে কোনও চিন্তাশীল মুক্তিকামী মানুষকে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করতেন। স্বভাবতঃই কমিউনিষ্টদের সাথে বিপ্লবী দল গুলির মেলবন্ধন হতে সময় লাগেনি। শুধু বাংলায় নয় পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রতিটি রাজ্যেই যেন অমোঘ ভাবেই এই মেল বন্ধন ঘটে। বৃটিশের বিরুদ্ধে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের রণনীতিতে আস্থাহীন বিপ্লবী দলগুলি তাঁদের দুর্গম যাত্রাপথে এক রাজনৈতিক দিশা খুজে পেলেন। পাঞ্জাবের 'গদর পার্টি' থেকে শুরু করে বাংলার অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল প্রায় প্রতিটি সংগঠনের অধিকাংশ সদস্যই কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শে সম্পৃক্ত হলেন।

সংগ্রামের পরবর্ত্তীকালে যে অসংখ্য অকুতোভয় তরুণ-তরুণ১২

। দেশজোড়া আন্দোলনে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছেন লাহোর থেকে রাজশাহী, হিজলী থেকে আন্দামান পর্য্যন্ত জেলের কাল কুঠুরিতে ফাঁসির অপেক্ষায় রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেছেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের পতাকাবাহী।

এই পুস্তকের ভূমিকায় উপরোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণার একমাত্র উদ্দেশ্য আধুনিক প্রজন্মের পাঠকের কাছে পীযূষ দাশগুপ্তের কৈশোর ও যৌবনের গড়ে ওঠার সময় কালটিকে তুলে ধরা। সেই আপোসহীন সংগ্রামে নিঃশর্ত আত্মাহুতির শক্তির উৎস সন্ধান।

পীযূষ দাশগুপ্ত

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯২২ সালের ৩০শে অক্টোবর অবিভক্ত বাংলার, অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর শহরে পীযূষ দাশগুপ্তের জন্ম। শিক্ষক গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত ও তাঁর সহধর্মিনী সুহাষিনী দেবীর সংসারে পীযূষ প্রথম সন্তান। মাদারীপুর হাই স্কুলের ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র ও ভাল খেলোয়ার। কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ।

স্কুল জীবনেই তিনি মাদারীপুরের বামপন্থী বিপ্লবী সংগঠনের সংস্পর্শে আসেন। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বগলা গুহ, রোহিনী ভট্টাচার্য্য, অনুকুল চ্যাটার্জী প্রমুখ বিপ্লবীরা। এই সংগঠনের সংস্কৃতি মঞ্চ — 'সাংস্কৃতিক সভায়ন' -এর তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। ১৯৩৭ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্য পদ লাভ করেন।

১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর ১৯৪০ সালে তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। এরপর চলে আসেন কোলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে। ১৯৪৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অর্থনীতি' বিভাগ থেকে এম. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। যদিও ছাত্রজীবনে পীযূষ দাশগুপ্ত ছিলেন একজন নিরলস রাজনৈতিক কর্মী তথাপি অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও তাঁর স্থান ছিল প্রথম সারিতেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে তিনজন তরুন ছাত্রকে কবির মরদেহে মাল্যদানের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে একজন হলেন পীযূষ দাশগুপ্ত।

১৯৪৪ সালে বাইশ বছর বয়সে তিনি নবদ্বীপে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর কলেজে প্রথম অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। নবদ্বীপের গোঁড়া গোষ্ঠী তখন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও কলেজের বিরুদ্ধে একজোট। তাদের মুখোমুখি হয়ে 'লেঠেল'দের হাতে মার খেয়ে পীযূষ দাশগুপ্ত রক্তাক্ত, অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। কিন্তু তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে যাননি। কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত বানচাল হয়েছিল। পরবর্তী কালে কোলকাতার সিটি কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ ও মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজেও তিনি অধ্যাপনা করেন। পাঁচের দশকে ছাত্রদরদী উজ্জ্বল অধ্যাপক হিসেবে প্রভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ঐ সময়ে রাজনৈতিক জগতেও 'মার্কসীয় অর্থনীতি'র তরুন প্রবক্তা রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। তৎকালীন অধ্যাপক আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল পুরোভাগে।

১৯৫৯ সালে মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ থেকে, কর্তৃপক্ষ তাঁকে বেআইনী ভাবে পদচ্যুত করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে ছাত্র ও শিক্ষক আন্দোলন শুরু হয়।

মাসাধিক কালের এই আন্দোলনে তিন দিন পশ্চিম বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট হয়। এমন ঘটনা আজও বিরল।

অর্থনীতি ছাড়াও দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে পীযূষ দাশগুপ্তের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। ১৯৬০ সালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশন সংস্থা "ন্যাশনাল বুক এজেন্সী"-র দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার সযত্ন তত্ত্বাবধানে ছয়-এর দশকে অসংখ্য দেশী ও বিদেশী চিরায়ত সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের পুস্তক প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু বিদেশী পুস্তকের বাংলা অনুবাদের কাজেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

১৯৬২তে কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার পূর্বে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে যে দীর্ঘ তত্ত্বগত লড়াই চলেছিল সেই মতাদর্শগত বিতর্কে পীযূষ দাশগুপ্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগুলি বুদ্ধিজীবি মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বস্তুত তাঁরই তৎপরতায় ও উদ্যোগে বামপন্থীরা সেদিন 'এন. বি. এ'র দখল রাখতে পারেন। অনতিকালের মধ্যেই ভারত সরকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী করলেন। অধিকাংশ নেতা জেলে বন্দী হলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, হরে কৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ নেতারা জেলের মধ্যে থেকেই বাইরে পার্টির গোপন কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। 'আন্ডার গ্রাউন্ড' পার্টির সেক্রেটারি হলেন সমর মুখার্জ্জী আর গণেশ ঘোষ ও পীযূষ দাশগুপ্ত ছিলেন অন্যতম সদস্য। সেই সময়ে আত্মগোপনে থেকে পীযূষ দাশগুপ্ত সারা পশ্চিমবাংলায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন, আন্দোলন পরিচালনা করেছেন ও জেলে বন্দী নেতাদের সাথে যোগাযোগও রক্ষা করেছেন।

ছয়-এর দশকের শেষ দিকে যখন 'নকশাল আন্দোলন' পার্টিকে আবার বিভক্ত করতে চলেছে, তখন দিনের পর দিন তিনি শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্য্যন্ত, প্রতি অঞ্চলে বিভ্রান্ত কমরেডদের সাথে আলোচনায় মুখোমুখি হন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে সমতূল্য আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁদের অনেকেরই পার্টির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনেন।

তিনি 'দেশহিতৈষী' ও 'পিপলস্ ডেমক্রেসী', এই দুটি পত্রিকারই সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ছিলেন। তখন বি. টি. রণদীভে ছিলেন 'পিপলস্ ডেমক্রেসী'র সম্পাদক। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন সত্যব্রত সেন, প্রভাস সিংহ, রামদাস প্রমুখ। দুটি পত্রিকাতেই নানা বিতর্কিত রাজনৈতিক বিষয়ে পীযূষ দাশগুপ্তর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও পাঁচের দশক থেকে নয়ের দশক পর্য্যন্ত মুখপত্র, পরিচয়, নন্দন, বাংলাদেশ, দি টেলিগ্রাফ, বর্ত্তমান ইত্যাদি বহু পত্র পত্রিকায় তাঁর অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলি বুদ্ধিজীবি মহলে আজও আদৃত। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "প্রথম আলো" উপন্যাসে পীযূষ দাশগুপ্তের "অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ" পুস্তকটির উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যিক সমরেশ বসুও ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট অনুরাগী। কবি নীরেন চক্রবর্ত্তীর সাথেও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর পত্রালাপ ছিল। সরোজ মুখোপাধ্যায়

তাঁর স্মৃতি কথায় 'দেশহিতৈষী'র প্রকাশনা ও পরিচালনা বিষয়ে পীযূষ দাশগুপ্তের অবদানের কথা বলেছেন।

ছয়ের দশক থেকে দীর্ঘদিন তিনি 'ওয়েষ্টবেঙ্গল কলেজ - ইউনিভার্সিটি টিচার্স এসোসিয়েশন' -এর নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৬৯ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত নেতাজীনগর কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। ঐ কলেজকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসামান্য। এই দশকেরই শেষ ভাগে তাঁর লেখা কিছু তত্ত্ব মূলক নিবন্ধকে কেন্দ্র করে সি. পি. আই. এম. এর নেতৃত্বের সাথে তাঁর মতান্তর এবং অবশেষে মনান্তরের সূচনা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পার্টির কর্মসূচী বা মতাদর্শগত দলিল নিয়ে কোনও মতভেদ ছিল না। বিরোধ ঘটেছিল ঐ মতাদর্শের প্রায়োগিক সমস্যা নিয়ে। তারই পরিণামে ১৯৩৭ থেকে ১৯৭৪ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসরের পার্টি সদস্যপদ তাঁকে হারাতে হল।

ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ'এর পরম স্নেহভাজন মানুষ ছিলেন পীযূষ দাশগুপ্ত। 'কাকাবাবু'র প্রেরণাতেই সাতের দশকে তিনি 'দাস-ক্যাপিটাল'এর বঙ্গানুবাদের কাজ শুরু করেন। পার্টি থেকে বিযুক্ত হওয়ার পরও গভীর নিষ্ঠার সাথে তিনি এই অনুবাদ সম্পূর্ন করেন। মার্কসীয় দর্শনের প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাসের সাথে নিরলস শ্রম ও প্রশ্নাতীত মনীষার ফসল 'ক্যাপিটাল'-এর এই বঙ্গানুবাদ।

গত শতকের শেষ দিকে পার্টির সাথে আবার তাঁর সেতুবন্ধন হয়। অনিল বিশ্বাস এবং বিমান বসু তাঁকে পুনরায় পার্টির নিজস্ব শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাব পীযূষ দাশগুপ্তকে নিশ্চয়ই উদ্বেলিত করেছিল, তবু জীবন সায়াহ্নে এসে আর কোনও বন্ধনে তিনি নিজেকে জড়াতে চান নি। তাঁর স্বাস্থ্য ও তাঁকে বাঁধা দিয়েছিল। জীবনে সেই প্রথম, চির সংগ্রামী, ঋজু মানুষটির চোখে জল এসেছিল।

২০০২ সালের ১২ই অগাষ্ট, উনআশি বছর বয়সে পীযূষ দাশগুপ্ত ব্যাঙ্গালোর শহরে তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সূচীপত্র ঃ

অনুলিপি

"২০০২ সালের ৩রা আগষ্ট, কোলকাতায় রোটারী সদনে,
পীযূষ দাশগুপ্তর স্মৃতিতে আয়োজিত স্মরণ সভায় কয়েকজন
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি মানুষের বক্তৃতা ও বার্তার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি"

		পৃষ্ঠা			পৃষ্ঠা
১।	অনিল বিশ্বাস	১	৪।	পরমেশ আচার্য	৫
২।	বিমান বসু	২	৫।	মৃনাল সেন	৬
৩।	সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী	৩	৬।	সনিল চট্টোপাধ্যায়	৭

-ঃ কবিতা ঃ-

		পৃষ্ঠা			পৃষ্ঠা
১।	স্বস্তি দাশগুপ্ত	৯	৫।	দীপিকা ভট্টাচার্য্য	১৪
২।	সুধীন বোস	১০	৬।	দীপা ভট্টাচার্য্য (দু'টি কবিতা)	১৫
৩।	নমিতা দাশগুপ্ত	১২	৭।	নুপুর দাশগুপ্ত	১৭
৪।	কাবেরী দাশগুপ্ত	১৩	৮।	স্বস্তি দাশগুপ্ত	১৮

— ঃ প্রবন্ধ ঃ —

		পৃষ্ঠা			পৃষ্ঠা
১।	গোলাম কুদ্দুস	১৯	১৫।	অমিতাভ সেন	৫৯
২।	প্রভাস সিংহ	২০	১৬।	অজয় কুমার ঘোষ	৬২
৩।	কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	২৪	১৭।	সুপ্রভাত সেন	৬৮
৪।	অমলেন্দু দে	৩১	১৮।	অজয় ঘোষ	৬৯
৫।	নবকুমার নন্দী	৩৫	১৯।	নিখিল মজুমদার	৭১
৬।	পন্ডিত শংকর ঘোষ	৩৯	২০।	ইরা মিত্র	৭৩
৭।	নীলিমা দাস	৪০	২১।	নির্মল সমাজ পতি	৭৬
৮।	নাসিমা দে	৪২	২২।	দিলীপ মজুমদার	৮০
৯।	কে. ডি. ঘোষ	৪৩	২৩।	শংকর দাশগুপ্ত	৮২
১০।	অঞ্জলী রায় চৌধুরী	৪৭	২৪।	বাসব দাশগুপ্ত	৮৬
১১।	দিলীপ মুস্তাফি	৪৯	২৫।	শমিতা চট্টোপাধ্যায়	৯০
১২।	সুবীর পোদ্দার	৫০	২৬।	সোমা দে	৯২
১৩।	চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	৫৩	২৭।	ক্ষিতিন্দ্র চৌধুরী	৯৪
১৪।	প্রাণকুমার মুখার্জ্জী	৫৮	২৮।	স্বস্তি দাশগুপ্ত	৯৭
			২৯।	সোহম দাশগুপ্ত	১১৩

সর্বজয়া

পীযূষ দাশগুপ্ত

" Life will assert it self "
Lenin

একি মহাবিস্ময় !
মৃত্যু শিলায়   কে হেথা হেলায়
জাগে মৃত্যুঞ্জয় !

হেথায় চন্দ্র হাত অভিনন্দন
প্রহত সূর্যালোক ;
হেথা বসন্ত শঙ্কিত - শিহরণ
হেমন্ত সে পলাতক।

হেথা দিগন্ত পাষাণের সীমায়ণ
ধরণী পাষান কায়া:
এযে নিষ্ঠুর পাষানী দুঃস্বপন,
প্রাণ হীন শিলা - মায়া।

তবু ভালো এই ভালো
মৃত্যু তিমিরে   পাষান শিয়রে
সূর্য প্রদীপ জ্বালো।

দিকে দিকে আজ কাঁপে থর থর
পাষানী দুঃশাসন;–
আবিসুবিয়াস ফুজিয়ামা কাঁপে
কাঁপে শিলা সিংহাসন।

ধূলিতে ধূলিতে প্রাণের বিস্ফোরণে
আকাশে প্রাণের ঝড় ;
দিগন্ত জুড়ি প্রানিল বর্ণায়নে
জাগে প্রাণ মর্মর।

জানি, জানি নিশ্চয়,
মরণের হবে চির পরাভব
জীবণের হবে জয়।

জানি অনেক মৃত্যু ঝরিয়াছে হেথা
ঝরিতেছে অহোরহ ;
তবু তুমি আছ আর আমি আছি
আছে জীবনের বিদ্রোহ।

শিলা কারাগার শাস্বত নয়
শাস্বত ফুল শর ;
তোমাতে আমাতে ওগো পার্বতি
তাই বেঁধেছি বাসর ঘর।

আমরা অপরাজেয় ;
আমি গাই গান তুমি তুলে ধরো,
রক্ত উত্তরীয়

দমদম জেলে হঠাৎ ফোটা একটি রক্তবর্ণ সর্বজয়া ফুলের উদ্দেশ্যে লেখা এই কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৬০ সালের "মুখপত্র" পত্রিকায়।



'কাকাবাবু'র সাথে নবদ্বীপে

আমার একান্ত পীযূষদা

অনিল বিশ্বাস

আমাদের খুব একান্ত জন কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আজ আমরা সমবেত হয়েছি। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। বিশেষ করে অর্থনীতি এবং দর্শন শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান এবং দক্ষতা সুবিদিত। একটা সময়ে তিনি পার্টির কতোগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনে যখন মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন পীযূষদা সি পি আই (এম) -এ যোগ দিয়েছেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে নবাগতরা মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে আসতেন, তাদের তত্ত্বগত বনেদ তৈরীর জন্য পার্টি ক্লাসে পীযূষদা খুব সহজ উপস্থাপনায় কমিউনিস্ট দর্শনের এবং অর্থনীতির মূল সূত্র বোঝাতেন। এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ উদ্যোগীর।

কিন্তু একটা সময়ে পার্টির সঙ্গে তাঁর কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়। তা থেকে মতের অনৈক্য। এই ভুল বোঝাবুঝি থেকেই পার্টির সঙ্গে তাঁর বিযুক্তি। কিন্তু এই বিযুক্তির পরেও আমৃত্যু তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি অনুগত থাকেন। সি পি আই (এম) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেননি। কমরেড সরোজ মুখার্জী যখন পার্টি সম্পাদক, তখন সরোজদার সঙ্গে পীযূষদার যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। তারপর নানা বিষয়ে রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তিনি মত বিনিময় করেছেন। একেবারে শেষ দিকে কমরেড বিমানদা এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন।

ব্যাঙ্গালোরে যাবার আগে আমার সাথে তাঁর কথা হয়। তিনি কতোগুলি দুস্প্রাপ্য দলিল এবং গ্রন্থ সংগ্রহ করার কথা বলেন। আমরা তা করবো। যে সব দলিল এবং গ্রন্থ আজ দুর্লভ এবং ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আমরা তা সংগ্রহ করছি।

আমাদের পার্টি এক দরদী বন্ধুকে হারিয়েছে। আমি আশা করি, তাঁর সঙ্গে পার্টির যে ভুল বোঝাবুঝি, তার নিরসন হয়েছে। মার্কসবাদে তাঁর অনমনীয় প্রত্যয়, পার্টির জন্য তাঁর অনলস শ্রম-এর মধ্যে তিনি বৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল। তাঁর বন্ধুরা এবং পার্টি সেই স্মৃতিকেই লালন করবেন।

আমার একান্ত পীযূষদা

অনিল বিশ্বাস

আমাদের খুব একান্ত জন কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আজ আমরা সমবেত হয়েছি। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। বিশেষ করে অর্থনীতি এবং দর্শন শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান এবং দক্ষতা সুবিদিত। একটা সময়ে তিনি পার্টির কতোগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনে যখন মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন পীযূষদা সি পি আই (এম) -এ যোগ দিয়েছেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে নবাগতরা মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে আসতেন, তাদের তত্বগত বনেদ তৈরীর জন্য পার্টি ক্লাসে পীযূষদা খুব সহজ উপস্থাপনায় কমিউনিস্ট দর্শনের এবং অর্থনীতির মূল সূত্র বোঝাতেন। এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ উদ্যোগীর।

কিন্তু একটা সময়ে পার্টির সঙ্গে তাঁর কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়। তা থেকে মতের অনৈক্য। এই ভুল বোঝাবুঝি থেকেই পার্টির সঙ্গে তাঁর বিযুক্তি। কিন্তু এই বিযুক্তির পরেও আমৃত্যু তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি অনুগত থাকেন। সি পি আই (এম) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেননি। কমরেড সরোজ মুখার্জী যখন পার্টি সম্পাদক, তখন সরোজদার সঙ্গে পীযূষদার যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। তারপর নানা বিষয়ে রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তিনি মত বিনিময় করেছেন। একেবারে শেষ দিকে কমরেড বিমানদা এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন।

ব্যাঙ্গালোরে যাবার আগে আমার সাথে তাঁর কথা হয়। তিনি কতোগুলি দুস্প্রাপ্য দলিল এবং গ্রন্থ সংগ্রহ করার কথা বলেন। আমরা তা করবো। যে সব দলিল এবং গ্রন্থ আজ দুর্লভ এবং ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আমরা তা সংগ্রহ করছি।

আমাদের পার্টি এক দরদী বন্ধুকে হারিয়েছে। আমি আশা করি, তাঁর সঙ্গে পার্টির যে ভুল বোঝাবুঝি, তার নিরসন হয়েছে। মার্কসবাদে তাঁর অনমনীয় প্রত্যয়, পার্টির জন্য তাঁর অনলস শ্রম-এর মধ্যে তিনি বৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল। তাঁর বন্ধুরা এবং পার্টি সেই স্মৃতিকেই লালন করবেন।

আপোষহীন মানুষ পীযূষদা

বিমান বসু

কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের মধ্যে তিনটি ধারার সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি একটা সময় অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ছিলেন কৃতী অধ্যাপক। ছিলেন সুলেখক এবং সফল অনুবাদক। আর অন্যতম ধারা তাঁর রাজনৈতিক জীবন।

ছাত্র আন্দোলনে আমি যখন যুক্ত হলাম, তার গোড়ার দিকের ঘটনা। অধ্যাপক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পুরোগামী পীযূষদা। অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁকে শাস্তি পেতে হ'লো। পদচ্যুত হলেন তিনি। অধ্যাপনার কাজের সঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ বপনের যে দায়িত্ব, আর এই দুরূহ কাজে কী বাধা, তা আজকের উত্তরসূরী তা উপলব্ধি করে উঠতে পারবেন না। রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে শাসক কুল অসহিষ্ণু ছিল, তাই পীযূষদাকে 'শাস্তি' পেতে হয়েছিল।

তিনিই প্রথম মার্কসের দাস ক্যাপিটালের সব কটি খন্ড বাংলায় অনুবাদ করার বিরল সাহস দেখিয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম ভূমিকা ছিল পার্টির শিক্ষক রূপে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শিক্ষনের ক্ষেত্রে, তাঁকে পার্টি নেতৃত্ব অনুমোদিত তালিকায় রেখেছিলেন। অসংখ্য পার্টি শিক্ষা শিবির এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ শিবিরে তিনি মার্কসবাদের দর্শন এবং অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মার্কসবাদী দর্শন সম্পর্কে এমন একটি শিবিরে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল।

পীযূষদা যা লিখতেন, তার শৈলী এবং বিষয় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো। কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবিদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখতেন না। তিনি এবং তাঁর ভাই অধ্যাপক শংকর দাশগুপ্ত — দুজনেই জটিল বিষয়ের সরল উপস্থাপনা করতেন। ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই উদ্দেশ্য কাজ করতো।

পীযূষদার মতো মানুষেরা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা এবং উপলব্ধির প্রসারিত জগৎ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করেননি। বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে আত্মনিয়োজন করেছেন। পীযূষদা আপোসে অভ্যস্ত ছিলেন না। নিজের বিচারধারার নিরিখে যাচিয়ে দেখতেন। গ্রাহ্য মনে হলে গ্রহণ করতেন।

যা জনগণের স্বার্থ-বিরহিত বা শিক্ষার পরিপন্থী, তা তিনি বর্জন করতেন। তিনি যে অধ্যাপক জীবনে বারবার লাঞ্ছিত হয়েছেন, তা স্বকীয় কোন অপরাধের জন্য নয়। বিশ্বাসে অবিচল থাকার জন্যই তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। জনগণের সংগ্রামকে প্রসারিত করতে, শিক্ষার চেতনাকে সম্প্রসারিত করতে পীযূষদার মতো ঋজু চরিত্রের আজও প্রয়োজন।

কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের স্মৃতি চিরজীবি হোক।

Friend, Philosopher & Guide

সত্যসাধন চক্রবর্তী

পীযূষবাবু আমার শিক্ষক ছিলেন। আমরা ওনার ক্লাস করতাম, তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম এবং ভালবাসতাম। এক কথায় friend philosopher and guide আমরা যারা পার্টি এবং ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত তারা অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তকে একজন পথ প্রদর্শক হিসাবেই দেখতাম অমায়িক ব্যবহার, মাধুর্য, অত্যন্ত সহজ সরল করে কঠিন বিষয়কে উপস্থাপনা এবং সেটাকে গ্রহণ যোগ্য করে তোলা, এতগুলো গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। শুধুমাত্র আমাদের পার্টির নেতা হিসাবে নয় একজন অধ্যাপক হিসাবেও তিনি আমাদের মোহিত করে রাখতেন। কোনও সমস্যা হলেই আমরা পীযূষবাবুর কাছে যেতাম। আমাদের মনে যে সব নানা প্রশ্ন উঠত, অত্যন্ত সহজ করে সুন্দর করে তিনি সে প্রশ্নের জবাব দিতেন সেগুলো ব্যাখ্যা করতেন। একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, ছাত্র বৎসল ছিলেন।

একটা কঠিন সময়ে যখন আমি কর্মচ্যুত হলাম, তিনি নিজেই আমাকে বললেন "তোমার চলবে কি করে ?" আমি বললাম " স্যার, কাজটা তো চলে গেছে তাই ভাবছি কি করা যায়।" তিনি উদ্যোগ নিয়ে আমাকে কয়েকটি টিউশন যোগাড় করে দিলেন। সেই উপকার আমি আজও ভুলিনি। এতো দরদ ছিল তাঁর ছাত্রদের প্রতি, পার্টির সদস্যদের প্রতি।

এরপর আমি অধ্যাপক হলাম। অধ্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমি আবার পীযূষ দাশগুপ্তর সান্নিধ্যে এলাম। যদিও অধ্যাপক আন্দোলনের চেয়ে আরও বৃহত্তর কাজে তাঁকে অনেক বেশী সময় দিতে হত তবু যতটুকু সময় পেতেন তিনি আমাদের নিয়ে বসে নানা আলোচনা, মত বিনিময় করতেন।

আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং অবিচল বিশ্বাস থাকার জন্য এবং তাঁর আপোষহীন মনোভাবের জন্য ওঁকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, চাকরী হারাতে হয়েছে। কিন্তু আপোষহীন ভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। পরবর্ত্তী কালে পার্টির মধ্যে কিছু মতপার্থক্যের ফলে পীযূষবাবু ধীরে ধীরে অনেকটা দূরে সরে গেলেন। নেতাজীনগর কলেজ, যেখানে তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, সেখান থেকেও নানা মত পার্থক্যের জন্য তিনি সরে এলেন। কিন্তু পীযূষবাবু কোনদিনই এ বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করেন নি। উপরের বিরোধটা উপরেই রেখেছেন। একবারও পার্টির বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কিছু বলেন নি, কারণ আমরা বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু আমরা শুনতাম যে বিরোধ চলছে। স্বভাবতই আমরা পার্টির নির্দেশেই চলতাম। আমি যখন অধ্যাপক আন্দোলন করি আমার খুব

খারাপ লাগতো, উনি যখন নেতাজীনগর কলেজের প্রিন্সিপাল, আমাকে সেখানে আন্দোলন করতে হচ্ছে। কিন্তু কষ্ট হলেও আমি জানতাম আমি পার্টির কর্মী, পীযূষবাবুকে যতই শ্রদ্ধা করি ভালবাসি না কেন, পার্টির সদস্য হিসাবে পার্টির নির্দেশিত পথে আমাকে চলতে হবে। অনেক সময় কষ্ট হয়, ছাত্র জীবনে যাঁকে শ্রদ্ধা করেছি, ভালবেসেছি। যাঁর কাছ থেকে মার্কসবাদের শিক্ষা লাভ করেছি, যাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি, তাঁর বিরোধী অবস্থান আমাকে গ্রহণ করতে হলা কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধের সময়েও আমি মনে মনে পীযূষ দাশগুপ্তর প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে অটুট রেখেছি। আজ আমার সেই শিক্ষকের প্রতি আবার শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করি।

আমার প্রিয় শিক্ষক

পরমেশ আচার্য

আমি পীযূষ দাশগুপ্তের ছাত্র ছিলাম। ১৯৪৯ এর পর যখন কমিউনিষ্ট পার্টি আবার আইনী হচ্ছে, তখন মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজে যে প্রথম ছাত্র ফেডারেশন ইউনিট তৈরী করা হয় সেটা আমরাই করেছিলাম। নৃপেন ব্যানার্জ্জী ও সরোজ হাজরা মশাই এসে এস. এফ ইউনিট খুলেছিলেন। সেটা হবে ৫১ সাল, আমি তখন জানতামও না যে পীযূষ দাশগুপ্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কেউ। ঘটনা ক্রমে একজন আমাকে বললেন যে এই কলেজেই একজন অধ্যাপক আছেন যিনি কমিউনিষ্ট। আমিও তখন সবে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছি, স্বভাবতই সম্পর্ক স্থাপিত হল। সেই সময় ছাত্র ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত দল একজোট তার মধ্যে আর. এস. পি. ফরোয়ার্ড ব্লক ও ছিল। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তখন সবাই একজোট। এই প্রতিকূল সময়ে যাঁকে সবচেয়ে কাছে পেলাম, যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দাঁড়াতে পারলাম তিনি হচ্ছেন পীযূষ দাশগুপ্ত। একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের।

ক্লাসে প্রথম যখন ওঁকে দেখি, সুদর্শন ব্যক্তিত্ব, অদ্ভুত ভাল বক্তা, ফলে স্বভাবতই আমি মুগ্ধ। আমার মত তখনকার মনীন্দ্র কলেজের ছাত্রদের কাছে সবচাইতে প্রিয় শিক্ষক ছিলেন পীযূষ দাশগুপ্ত এবং রথীন রায়।

একবার আমরা সর্বভারতীয় ব্যাক্তিত্বদের নিয়ে একটি সিম্পোসিয়াম এর আয়োজন করি, সেখানে অধ্যাপক অতীন বসু, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, ব্যারিষ্টার দত্ত এদের কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি গেলাম পাটি অফিসে প্রমোদ বাবুর কাছে, কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে একজন সর্বভারতীয় স্তরের পন্ডিত ও সুবক্তার জন্য। প্রমোদ বাবু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে চুরুট মুখে নিয়ে বসে ছিলেন। সব শুনে বললেন "এখানে এলেন কেন ? আপনাদের মনীন্দ্র কলেজেই তো পীযূষ দাশগুপ্ত আছেন।" ওনার কথায় আমার মনে হল যে পীযূষ বাবুর ওপর প্রমোদ বাবুর শুধু বিশেষ স্নেহ ছিল না, ছিল দারুন আস্থা।

পরবর্ত্তীকালে পীযূষবাবু ছোট ছোট গ্রুপে আমাদের নিয়ে মার্কসীয় অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আমি আজ হয়তো কিছু গবেষণা করি বা বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি করি, কিন্তু তখন তো মার্কসীজম বুঝতাম একথা দাবী করব না। সেই প্রথম, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে মার্কসবাদের যে তাৎপর্য তা আমি পাই পীযূষ দাশগুপ্তর কাছে।

পীযুষ দাশগুপ্ত শুধু অধ্যাপক ছিলেন না, তিনি ছিলেন বক্তা, তিনি ছিলেন একটি সংগ্রামী ব্যাক্তিত্ব। ঐ সময়ের আমাদের মত নব্য যুবকদের সঙ্গে এতো সহজ ভাবে বিভিন্ন আলোচনা করতেন যে আমি বিশ্বাস করি যে আজও তখনকার আমলের যারা ছাত্র তাদের গড়ে ওঠার পেছনে পীযূষ দাশগুপ্তর অবদান সর্বাধিক।

পীযূষের কথা

মৃণাল সেন

কৈশোর ছাড়িয়ে স্কুলের পাট চুকিয়ে যখন কলেজে ঢুকি তখনই পীযূষের সঙ্গে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। চিন্তা, ভাবনা জীবন যাত্রার মধ্যে ফারাক ছিল না বলেই সম্পর্ক গাঢ় হতে সময় লাগেনি। বেশ কয়েক বছর এই ভাবেই চলল। তারপর সাধারণত যা ঘটে, দেখা সাক্ষাৎ ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল। পীযুষ জড়িয়ে পড়ল নিজের কাজে, আমি ডুবে গেলাম নিজের পরিবেশে। কিন্তু দেখা শোনা কালেভদ্রে হলেও আমরা একে অপরের খবরাখবর রেখে চলছিলাম। সকলের ক্ষেত্রেই কমবেশী যেমন ঘটে সংগঠনিক জীবনের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিশ্বাসের মধ্য থেকেও কিছু তিক্ততায় পীযুষ এক সময় জড়িয়ে পড়ল। বেশ যন্ত্রণা পেয়েছিল তখন, কাছের মানুষেরা তা জানত, আমারও অজানা ছিল না। তবু এক আশ্চর্য স্পষ্টতা নিয়ে পীযূষ দাঁড়িয়ে ছিল শেষ পর্যন্ত। এইখানে আমাদের সকলের চোখে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে পীযূষ। যেখানেই থাকি পীযুষকে আমি ভুলতে পারব না।

আমাদের পীযূষদা

সলিল চট্টোপাধ্যায়
(বাগবাজার)

আমি মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের ছাত্র ছিলাম। যদিও আমার বিষয় ছিল অর্থনীতি তথাপি কলেজে পীযূষদার কাছে সরাসরি শিক্ষা লাভের সুযোগ আমার হয়নি। আমি ওণার ভাই শংকরদাকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম। কিন্তু যখন মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হই তখন পার্টি ক্লাসে যোগ দিয়ে আমি পীযূষদাকে আমার শিক্ষক হিসাবে পাই। সেই সময়ে উনি আমাদের অনেকগুলি ক্লাস নিয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। তখন আমাদের মনের মধ্যে এক প্রচন্ড আবেগ, আর তারই সাথে সাথে পথ খোঁজারও চেষ্টা। যে অল্প কিছু মানুষ সেই পথের দিশা আমাদের দিতে পারতেন তাঁদের মধ্যে পীযূষদা ছিলেন অগ্রনী।

ষাটের দশকে পীযূষদা আমাদের বাগবাজারেই থাকতেন। আর থাকতেন কমরেড মোহিত মৈত্র। আমরা একসময়ে ওনাদের দূর থেকে দেখতাম। ক্রমশঃ ঘনিষ্টতা বাড়লো। ১৯৬৭ সালে পীযূষদা আমাদের কাশীপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করলেন। এই নির্বাচণের সময়ে দেখলাম পীযূষদার আর এক চেহারা। বুঝতে পারলাম যে উনি শুধু একজন শিক্ষক বা বুদ্ধিজীবিই নয়, উনি একজন বিরাট সংগঠকও। কাশীপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রায়ই আমাদের ওপর বোমাসহ আক্রমন ঘটত। আক্রান্ত কমরেডদের সাহস যোগাতে, উদ্দীপিত করতে, তখন পীযূষদাকে দেখেছি প্রথম সারিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আক্রমণের মুখোমুখি হতে। অসম্ভব সাহসী মানুষ ছিলেন তিনি। নির্বাচনে সামান্য ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। কমরেডরা, তখন বেশ আশা হত। কিন্তু পীযূষদা তখনও অপরিবর্তীত, প্রাণপন্ত। পাড়ায়, পাড়ায়, এলাকার মানুষদের, কমরেডদের বোঝানেন —

"হারাটা বড় কথা নয়, লড়াইটাই বড় কথা। যে বিশ্বাস নিয়ে আমরা চলছি, সেই যাত্রাটাই আসল কথা।" পরবর্ত্তী সময়ে কাশীপুর কেন্দ্র থেকে বহুবার সি. পি. আই. এম. প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। কারণ ষাটের দশকে পীযূষদা আমাদের মনে যে চেতনা, যে বিশ্বাস এবং যে আস্থা সঞ্চারিত এবং প্রোথিত করেছিলেন তা অপরাজেয়।

ভাবতে অবাক লাগে, পীযূষদা যখন এম. এ. পড়ছেন তখন আমার জন্ম। বয়সের দুস্তর তফাৎ, কিন্তু উনি যেন আমাদের মনের মাঝখানে মিশে থাকতেন। আগেই বলেছি, কলেজ জীবনে আমি পীযূষদাকে প্রথাগত শিক্ষকের ভূমিকায় পাইনি। কিন্তু যখনই "ইন্টার কলেজ ড্রামা কম্পিটিশন"-এ গেছি বা কলেজে নতুন করে 'এস. এফ' এর ইউনিট খোলা হচ্ছে, সব সময়েই পীযূষদাকে সঙ্গে পেয়েছি। উনি নিজে তখন কলেজে নেই, তবু আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির জগৎ

থেকে রাজনীতির জগৎ পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই উনি যেন একজন " Legend " -এর মত কাজ করেছেন। শুধু তত্ত্বই নয়, তাকে বিশ্বাসে পরিণত করা ; সেই বিশ্বাসে নিজের মনকে জারিত করার এবং তারই তাগিদে নিজেকে সমাজ পরিবর্ত্তনের কাজে নিয়োজিত করার আদর্শ উদাহরণ ও প্রেরনা ছিলেন পীযূষদা। উনি আমাদের প্রভাবিত করেছেন, চিন্তিত করেছেন এবং সবশেষে সঠিক পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এই জন্যই পীযূষদা একজন আদর্শ শিক্ষক।

পার্টির সাথে যখন পীযূষদার ব্যবধান, উনি তখন টালিগঞ্জে। মাঝে মাঝে বাগবাজারে আসতেন। আমার সাথে দেখা হয়েছে। একবার 'বাংলাদেশ' পত্রিকার অফিসেও ওনার সাথে দেখা হয়। তখন উনি "দেশহিতৈষী" পত্রিকার প্রথম সংখ্যাগুলোর সন্ধান করছিলেন। আমি আমাদের কমরেড শ্যামল নন্দীর কাছ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে পীযূষদাকে দিয়ে এসেছিলাম। পীযূষদার প্রয়োজন জেনে শ্যামলদাও কোনও দ্বিধা করেননি।

পীযূষদা যখন বাগবাজারে, তখন "মৌসুমী" নামে আমাদের একটা নাটকের গ্রুপ ছিল। সেটা ৬৬ - ৬৯ সালের কথা। আমরা তখন মিছিলে মিছিলে গান গাই, আর সভায় সমাবেশে নাটক করি। সে ব্যাপারেও পীযূষদার উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল অসাধারণ। নাটক দেখার পর সে বিষয়ে আলোচনাও করতেন। আমরা আরও অনুপ্রাণিত হতাম। কারণ পীযূষদার কাছেই পেতাম সঠিক পথনির্দেশ। আমার আজও মনে আছে, পীযূষদার ছেলে 'সোহম' সেই সময়ে ওর একটি কবিতায় আমাদের "মৌসুমী" -র কথা লিখেছিল। আসল কথা হল পীযূষদা ছিলেন একজন "স্বাভাবিক শিক্ষক"।

পীযূষদা যখনই বিভিন্ন 'ক্লাসে' বা আলোচনায় আমাদের ইতিহাসের কথা বলতেন আমরা প্রতিদিন নতুন করে ভাববার রসদ পেতাম। এরকমই বিভিন্নভাবে সর্বদা মানুষকে উদ্দীপিত করার এক অসামান্য ক্ষমতা ছিল ওঁর।

অবশেষে যেদিন উনি ব্যাঙ্গালোরে চলে গেলেন, আমার সাথে দেখা হয়নি। বৌদি (ওঁর স্ত্রী) আমার স্ত্রীকে একটি বই দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ পীযূষদা আরও দূরে। তবু জানি আমাদের যোগাযোগ, অতীতে যেমন ছিল আজও আছে এবং চিরকালই থাকবে।

স্মরণ করি

স্বস্তি দাশগুপ্ত

অমিয়ার বরপুত্র তুমি, শুধু নামে নয়-
অমৃত নির্ঝর তব বিপুল হৃদয়।
উজ্জ্বল নক্ষত্র চোখে দীপ্ত অঙ্গিকার,
শুভ্র প্রশান্ত মুখ হাসিতে উদার।
তোমার বৈশাখী বিশ্বাস দুঃখের শ্রাবণে
মানুষে উতল করে প্রাণের প্লাবনে।
তত্ত্বের ডুবুরী তুমি, অতলের তলে
মুক্তা খুঁজেছ জীবনের প্রতি পলে
আবার অকাতরে বিলায়েছো সবই.
দর্শনে মিলায়েছ মার্কস ও রবি।
যখন প্রলয় শাঁখে কাঁপিল বাতাস
ঝঞ্ঝায় ভগ্নতরী, নির্দয় আকাশ
সে দীর্ঘ অমানিশা, সকল দ্বন্দ্ব দুঃখ,
হৃদয়ে, রক্তপাত, প্রত্যয়ে উদাস মুখ,
কী বিস্ময়ে বন্ধু দেখেছি তোমায়
আঘাতেরে ফিরায়েছ নীরব ক্ষমায়।
বিপুল হৃদয় জুড়ে ছিল শুধু আশা,
ব্যর্থ হবেনা কভু এত ভালবাসা।
এ আকাশ, সূর্য, চন্দ্র যদি সত্য হয়
ইতিহাস গাইবেই জীবনের জয়।
তোমার প্রত্যয় আজও দৃপ্ত প্রতীতি
সহস্র হৃদয় মাঝে তাই
তুমিই চরৈবেতী, চরৈবেতী।।

চলে গেলে
প্রয়াত পীযূষ দাশগুপ্ত স্মরণে

সুধীন বসু

যে কথা ভেবেছিল মন
রয়ে গেছে মনের আড়ালে
আজ তা প্রকাশ করা
স্মরণ সভায়
কি জানি, কেউ যদি থেকে যায় আজও
বিষ ফণা তুলে !

কি চেয়ে, কি পেলাম
কত দাম দিয়ে
রক্ত শূন্যতায় কেউ যায় মরে
রক্ত দিয়ে, সে রক্তে
বিষ আছে বলে...... ।

সেদিন তোমার শঙ্খধ্বনি শোনেনি কেউ
যদি কিছু থেকে থাকে অসঙ্গীতির ঢেউ
'ফুলগুলি সারাদিন মাঠে মাঠে ঘোরে'
দেখেছো কী ? 'গাছের গোড়ার মাটি
কত গেছে সরে' .... !
সে হিসেব না জেনে তুমি চলে গেলে।

এতদিনে বেড়ে গেছে অনেকের আকাঙ্খার
দোর্দন্ড প্রতাপ, আরও কত কথা ....
জানা হয়ে ওঠেনি, এমন
অনেক বারমাস্যা গাঁথা।

ক্ষুরধার বুদ্ধি, প্রতিবাদী মন
থেকেছে নিঃসঙ্গ, বেদনায় চঞ্চল
কে তার হিসেব রাখে — চোখে,
ঝরে গেছে এক নদী জল।

এমনও দিন আসবে বলে
অনেকে স্বপ্নেও ভাবেনি
স্বপ্নভরা চোখ, দেখেছিল
সে কথা গোপন করেনি।

দুঃখের ইতিহাস কেউ ভুলে যায়
তবুও তা ইতিহাস হয় ....
দুর্নীতির কালো মেঘ
এখানে ঘুরপাক খায় ....
পূর্ণিমার চাঁদও ম্লান হয়ে, হায়
আড়াল পড়ে যায় !

নির্ভীক সাহসী যোদ্ধা
চিরনিদ্রায় বুদ্ধ হয়ে, মুক্ত আকাশের তলে
সত্যের ধ্রুবতারা হয়ে
মানুষের মনে, জ্বল জ্বল জ্বলে।

রোটারী ক্লাব সভাঘর
কলকাতা
৩রা, অক্টোবর, ২০০২।

অনুভব

নমিতা দাশগুপ্ত

কোন এক লড়াইয়ের ময়দানে
যেখানে তাঁর ভূমিকা ছিল অন্তরালে
দৃঢ় প্রত্যয়ী সাংগঠনিক প্রতিভা রূপে
তখনি জেনেছি তাঁর পরিচয়
সত্যনিষ্ঠা বিশ্বাসে দৃঢ়তা
ঋজুতা দেহে ও মনে
থেকেছে যা শেষ ক্ষণ অবধি।

দেখেছি তাঁকে সম্পর্কের
স্বাভাবিক দূরত্ব থেকে
স্নেহময় মৃদুভাষী রূপে
উজ্জ্বল সৌম্য ব্যক্তিত্ব এক
সাংসারিক নানা আবর্তের মাঝে
স্থিতধী অচঞ্চল বেশে

শেষ দেখা কয়েকটি মুহূর্তের
তুমি কেন নেমে এলে
তুমি তো সুস্থ নও
সস্নেহ এই দুটি বাক্য শেষে
দৃষ্টির আড়ালে মিলায়
জীবনের একটি অধ্যায়।

অভিমানী আত্মনির্বাসনে

কাবেরী দাশগুপ্ত

প্রবাসে দৈবের বশে ?
নাকি স্বভূমির প্রত্যাখ্যান
প্ররোচিত করেছে তোমাকে
অভিমানী আত্ম নির্বাসনে ?

অথচ কৈশোর থেকে
সূর্যোদয় আড়িয়াল খার তীরে
তুমি দেখেছিলে রক্তপতাকার প্রতিভাস।
জেনেছিলে মানুষের ক্রম মুক্তি সম্ভব নয়।
একমাত্র বিস্ফোরক বিস্ফোরণ
এনে দেবে প্রসন্ন প্রভাত।

কারাগার অথবা পলাতক জীবন
কখনো ভাবেনি সে বীমাকৃত লগ্নীর মতোন।
বরং কৃচ্ছ কঠোর তিতীক্ষা ভেবেছিল সে,
আচরিত জীবনের বাসনা-বর্জিত
দিনলিপি একাত্ম করবে তাকে
শ্রমজীবি মানুষের সাথে।

জীবন একমাত্র উৎ সর্গীকৃত জীবনই পারে
অবাস্তব মহড়ার প্রেরণা দিতে।
কালে কালে সব পথ শেষ হয়
প্রাতিষ্ঠানিক সিংহ দুয়ারে।

লুণ্ঠিত স্বপ্নের বেলাভূমি
ভৎর্সিত স্তালিন ।
একমাত্র যাজকেরা পরোয়ানা দেয়
কেড়ে নিতে পারে মহিমার সব চিহ্ন
ধূলায় মলিন পুঁথি একদিন আবিস্কার হলে
হলোই বা মরণোত্তর
সান্তনা পুরষ্কার
উত্তরসূরী সাহস রাখে না
প্রত্যাখ্যানের।

" অগ্রজ "

দীপিকা ভট্টাচার্য্য

জেনেছি বিদ্যার বিভায় তুমি উজ্জ্বল
অনেক বড় রাজনৈতিক চালচিত্র তোমার পিছনে,
কিন্তু আমার একান্ত জানা একটু অন্য রকম
যেখানে তুমি শুধু তুমিই।
শিশুকাল থেকে অগ্রজের যে মূর্তিটি
মনে মনে এঁকেছি, প্রৌঢ়ত্বের কিনারা অবধি,
হঠাৎ তোমায় দেখে আমার উচ্ছ্বসিত মনে
তরঙ্গায়িত হোলো কাঙ্খিত ডাক
দাদা দাদা আমার দাদা
ছেলে বেলায় দাদার যে স্নেহমাখা হাতটির স্পর্শ,
মাথায় পাবার জন্য ব্যাকুল ছিলাম —
তা পূর্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে।
তোমার জ্ঞান, তোমার গরিমা সব কিছু কে,
শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি —
তোমার অপরূপ স্নেহময় রূপেই তোমার পূর্ণতা
সেখানেই তুমি তুমি ।।

" তোমাকে দাদা "

দীপা ভট্টাচার্য্য

চলে গেল সর্ব্বজেষ্ঠ ভ্রাতা মোর, পার হয়ে জীবন দোর
অসীম বিস্তৃত আকাশে হয়ে এক তারা
মিলে মিশে বহুদিন যারা হোল হারা
হে জননী কাঁদিব না আমি, আছ তুমি নির্মল লোকে,
তুলে নাও আপন সন্তানে তব স্নেহচ্ছায়া বুকে।
সর্বজেষ্ঠ সন্তান তোমার আদরের ধন,
জড়ায়ে রেখ তারে প্রতি অনুক্ষণ
বাকী যারা আছে ওগো তোমারই কাছে
জানি তারা জানি মাগো ভাল সব আছে।
তবু মোর রক্তে রাজে নিদারুণ ব্যথা
মৃত্যু সত্য জীবনেরে ছাড়ি, ভুলি যে এ কথা।
বাকরুদ্ধ আমি মাগো বিচ্ছেদ বেদনায়,
পৃথিবীর তাহাতে কি আসে যায়
চলেছে তো সব কাজ, থামে নাই কিছু,
অনন্ত কান্নারে লুকাব যে পিছু।
দাদা মোর, ভুলিব তোমারে কেমনে ?
ছোট ছোট স্মৃতি গুলি বাজিছে মনে।
ফিরিয়া গিয়াছি আমি সেই ছোট বেলা,
স্নেহাদরে খেলিছ আমারই যত খেলা।
ঝাপিয়া পড়েছি আমি তোমারও কোলে,
স্মৃতিগুলি আজ সব চোখেরও জলে।
মুছিলাম অশ্রু কাঁদিব না আমি,
মিলিব আবারও সব জানি তা জানি।
দুঃখ বেদনা কিছু থাকিবে না আর,
তারা হয়ে মিশে যাব সবার মাঝার।

" অগ্রজ "

দীপিকা ভট্টাচার্য্য

জেনেছি বিদ্যার বিভায় তুমি উজ্জ্বল
অনেক বড় রাজনৈতিক চালচিত্র তোমার পিছনে,
কিন্তু আমার একান্ত জানা একটু অন্য রকম
যেখানে তুমি শুধু তুমিই।
শিশুকাল থেকে অগ্রজের যে মূর্তিটি
মনে মনে এঁকেছি, প্রৌঢ়ত্বের কিনারা অবধি,
হঠাৎ তোমায় দেখে আমার উচ্ছ্বসিত মনে
তরঙ্গায়িত হোলো কাঙ্খিত ডাক
দাদা দাদা আমার দাদা
ছেলে বেলায় দাদার যে স্নেহমাখা হাতটির স্পর্শ,
মাথায় পাবার জন্য ব্যাকুল ছিলাম —
তা পূর্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে।
তোমার জ্ঞান, তোমার গরিমা সব কিছু কে,
শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি —
তোমার অপরূপ স্নেহময় রূপেই তোমার পূর্ণতা
সেখানেই তুমি তুমি ।।

" তোমাকে দাদা "

দীপা ভট্টাচার্য্য

চলে গেল সর্ব্বজেষ্ঠ ভ্রাতা মোর, পার হয়ে জীবন দোর
অসীম বিস্তৃত আকাশে হয়ে এক তারা
মিলে মিশে বহুদিন যারা হোল হারা।
হে জননী কাঁদিব না আমি, আছ তুমি নির্মল লোকে,
তুলে নাও আপন সন্তানে তব স্নেহচ্ছায়া বুকে।
সর্বজেষ্ঠ সন্তান তোমার আদরের ধন,
জড়ায়ে রেখ তারে প্রতি অনুক্ষণ।
বাকী যারা আছে ওগো তোমারই কাছে
জানি তারা জানি মাগো ভাল সব আছে।
তবু মোর রক্তে রাজে নিদারুণ ব্যথা
মৃত্যু সত্য জীবনেরে ছাড়ি, ভুলি যে এ কথা।
বাকরুদ্ধ আমি মাগো বিচ্ছেদ বেদনায়,
পৃথিবীর তাহাতে কি আসে যায়
চলেছে তো সব কাজ, থামে নাই কিছু,
অনন্ত কান্নারে লুকাব যে পিছু।
দাদা মোর, ভুলিব তোমারে কেমনে ?
ছোট ছোট স্মৃতি গুলি বাজিছে মনে।
ফিরিয়া গিয়াছি আমি সেই ছোট বেলা,
স্নেহাদরে খেলিছ আমারই যত খেলা।
ঝাপিয়া পড়েছি আমি তোমারও কোলে,
স্মৃতিগুলি আজ সব চোখেরও জলে।
মুছিলাম অশ্রু কাঁদিব না আমি,
মিলিব আবারও সব জানি তা জানি।
দুঃখ বেদনা কিছু থাকিবে না আর,
তারা হয়ে মিশে যাব সবার মাঝার।

জীবন মৃত্যু

দীপা ভট্টাচার্য্য

একে একে নিভিছে প্রদীপ, হতেছে অদৃশ্য আলো,
জীবনেরে কেনা চাহে ? কেনা বাসে ভাল
তবু আসে অন্ধকার তবু পড়ে অশ্রুজল তবু ভাঙ্গে মন,
বৃথা এতো, মৃত্যুর পথ রোধ কেন অকারণ ?
আসিবে ডাক যেদিন যেতে হবে চলিয়া,
সহসা নামিবে আঁধার কিছু না বলিয়া
দিশা হারা ক্রন্দন বাজিবে চারিধার —
বিচ্ছেদ বেদনার সঙ্গীত হাহাকার।
চলেছে পৃথিবীর নিয়ম নিশ্চিন্ত নীরবে এরই লাগি,
উৎকণ্ঠিত কেন মোরা জীবনেরে মাগি ?
মৃত্যুরে আলিঙ্গন কেমনে করিব তবে ?
জীবন মৃত্যুর ভেদাভেদ ভুলিব যবে।

" প্রতিধ্বনি"

নূপুর দাশগুপ্ত

আর একবার
আশাবরী হাত
মেলেছি স্বপ্নের দিকে —
আবার সবল হব
কবিতা বা দর্শনে,
আমাদের আছে এই,
স্বপ্ন দেখা তবু,
চড়া রোদে জীবনের
ছায়া - রচনা
মহীরুহ প্রসারিত হবে,
রাতের মায়ায় চেয়ে
তারা, নিস্তব্ধ,
নিরালোক, অন্তহীন গতি
চিত্তমান পদক্ষেপ
ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বে আশা -
ওপারে এক অনির্বচনীয়
তোমরা হে সকল
বাস্তবের প্রশাখা
মেলে দাও হাত
ওপারে সে আছে
আমাদেরই মত,
নির্বাক হয়তো সম্প্রতি,
কায়াহীন প্রায়,
তবু সর্ব্বাজয়া বীজ
অসীম আশায়
আবার সঞ্জীবিত হবে
কবিতায়, দর্শনে —

The Storm

Swasti Dasgupta

I love the storm.
It is turbulent,
It comes,
And nests are broken
Dams are broken too.
Paddy fields are flooded
Fishes limp on the ground
Rain-soaked birds shake off the water
from the feathers.
Hapless people, rendered homeless,
run for shelter under the banyan tree.
Shades of blue and green blend in the back drop of clouds.

I love the storm
It appears in a mood of destruction
But carries the memories of peace with it.
How many things of the past
are brought back to mind
Just like a poem with its rhythm broken
here and there.

The sweet notes from the anklets
of dancing *baul* girls
Waft all around, all day.
The tune of my childhood rhyme
Plays on the *ektara* far and wide.
And the melody of the 'dropping rains, throbbing leaves'
Resound everywhere.
A ceaseless voice from afar
Calls me fondly day and night.

Come on, oh dear !
Come on, here !
Yes I love the storm
Turbulent without,
Tranquil within !

পীযূষ দাশগুপ্তের কাছে রক্তের ঋণ

গোলামকুদ্দুস

কমরেড পীযূষ দাশগুপ্ত একটা গুরুতর অপারেশন কেসে আমাকে রক্ত দিয়ে চিরতরে ঋণী করে গেছেন।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, নীলরতন সরকার হস্‌পিটালের সেই ঘটনার কথা আজো কেন বিস্মৃতির তলায় হারিয়ে যায়নি তাই ভাবি।

রক্তদানের ব্যাপারটা ডাক্তার বা বন্ধুবান্ধব কেউ আমাকে বলেন নি পাছে রুগী হিসাবে আমি শঙ্কিত হই। কিন্তু আমার তত্ত্বাবধায়ক নার্স কমলা-সিস্টার আমার কাছে সেটা গোপন করতে পারেন নি তাঁর বিশেষ মানসিক অবস্থার ফলে। 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'য়ের পরে যখন তিনি হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরছিলেন, তখন 'মাসি— বলে তাঁর কাছে ছুটে আস্‌ছিল তাঁর শিশু বোন-পো, পথিমধ্যে সে এক মুসলিম দাঙ্গাবাজের ছুরিকাঘাতে রক্তের বন্যা নিয়ে মাসির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েই মারা যায়। সেই থেকে কমলা-সিস্টার মুসলিমবিদ্বেষী হন। হেন ব্যক্তি স্বভাবতই আশ্চর্য হয়ে একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসেন, তাঁরা কি সবাই হিন্দু ?'

'সবাই কমরেড।'
'তার মানে সবাই কমিউনিস্ট? আমি কমিউনিস্টদের ঘৃণা করি।'
'কেন ঘৃণা করেন ?'
'সবাই তো করে। আচ্ছা, আপনার জন্য যারা রক্ত দিল, তারা সবাই কি হিন্দু ?'
'রক্ত দিল ! জানি না তো ? জিজ্ঞাসা করে দেখব।'
'মুসলমানরা হিন্দুদের এত রক্ত নিল, আবার কেন তারা মুসলমানকে রক্ত দিচ্ছে !'
ঘটনা-পরম্পরায় কমলা-সিস্টারের আমূল রূপান্তর ঘটে, কিন্তু সে এক ভিন্ন কাহিনী।

শেষ পর্যন্ত আমার অপারেশনে কোনো রক্তের প্রয়োজন হয়নি। তবু কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের রক্তের ঋণ আমি কোনোদিন পরিশোধ করতে পারব না। হায়রে, সে রক্ত যে আমার সমগ্র চেতনার প্রতি পরতে পরতে প্রবেশ করেছিল, কমরেড পীযূষ দাশগুপ্ত যে আমাকে তাঁর রক্তের ভাই করে নিয়েছিলেন।

— ১২ই ডিসেম্বর, ২০০২।

বন্ধু পীযূষ দাশগুপ্তের স্মরণে

প্রভাস সিংহ

'বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ' — রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকার' কোন এক কবিতার লাইন। এই লাইনটা আজকাল বারবার আমার মনে আসা - যাওয়া করে। চুরাশি পেরিয়ে পঁচাশিতে পড়ব। দীর্ঘায়ু ভোগার কিছু দুর্ভোগ আছে। মাসে মাসে তার মাশুল দিতে হয়। তার একটা চরম নিদর্শন হচ্ছে পীযুষবাবু সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করতে হচ্ছে — বিশেষ করে এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি বয়সে ছোট আর প্রায় পঞ্চাশ বছরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আত্মার আত্মীয় বলা চলে। দীর্ঘকাল টিকে থাকার দায় স্বরূপ তাঁর শোক সভায় আহ্বায়ক আর স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করতে হোলো। এরকম বিড়ম্বনা পীযূষবাবু আমার ঘাড়ে চাপিয়ে যাবেন কখনও ভাবিনি।

পীযূষবাবু আমার কিশোর বা যৌবনের বন্ধু নন। আমি প্রৌঢ় বয়সে অধ্যাপনায় যোগ দিই আর সেই সময় পীযূষবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। যতদূর মনে পড়ে উনিশশো পঞ্চান্নোর শেষ দিকে — ওয়েবকূটার কোন এক বাৎসরিক সভায়। পরে যত দিন গেছে, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তবে ঘনিষ্ঠতা একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে পরিণত হয়েছে সেটা আবিষ্কার করলুম ১৯৭৪ সালের জুন মাসে যখন আমাকে পার্টি আর পীযূষবাবুর মধ্যে বেছে নিতে বলা হল। প্রায় পনের দিন ধরে মনের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলে। তার পরে আমার ইউনিট - সম্পাদককে লিখে জানিয়ে দিই আমার সিদ্ধান্তের কথা। আমি তখন People's Democracy ইউনিটের সদস্য পীযূষবাবুকে ঘুনাক্ষরে জানতে দিইনি আমি কি করতে চলেছি। আমার সিদ্ধান্ত একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমি দোটানায় থাকতে চাইনি বা পারিনি। পরে পীযূষবাবু যখন জানতে পারেন তিনি আমার সিদ্ধান্তে সায় দেন নি। তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার ঘুনমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমি বলেছিলুম আমি যা করেছি তা করেছি আমার নিজের মানসিক শান্তির জন্য — আপনি হয়তো উপলক্ষ্য।

এই অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠার Chemistry আমার কাছে আজো রহস্য রয়ে গেছে। ছাত্রবয়সে অলিভার গোল্ডি স্মিথের একটা প্রবন্ধের কয়েকটা কথা মনে পড়ছে ঃ 'Though found of many acquaintaces, I desire intimacy with a few' গোল্ডস্মিথ desire এর কথা বলেছেন। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সচেতন বাছাইয়ের ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না। দুজনের স্বভাবের হয়তো কিছু মিল ছিল, কিন্তু অমিলও কম ছিল না। পীযুবাবুর শান্ত, সৌম্য চেহারার আড়ালে এক দুর্বার আবেগ ছিল। কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি হয়তো ভাবতেন। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা অবিচলিত আবেগ (ইংরেজিতে যাকে বলে passion) এর অনুসরণ করতেন। তখন সাধ্য কার রোধে তার গতি। ক্ষতির পরোয়া করতেন না। মনীন্দ্র কলেজ নিয়ে যে আন্দোলনের সময় এই দুর্বার আবেগ লক্ষ্য করেছি। পার্টি ভাগাভাগির সময় এই আবেগ

দেখেছি। পার্টি ছাড়ার পরও বিকল্প পথের সন্ধান করেছেন প্রচন্ড আবেগের সঙ্গে। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে intervene করার চেষ্টা করে বিফল হয়েছি কিন্তু তার সঙ্গ ছাড়িনি।

এই আবেগের সঙ্গে ছিল এক ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর সততা। পীযূষবাবুর মত সৎ ও স্বার্থবোধহীন মানুষ গোষ্ঠীস্বার্থের few -এর মধ্যে পড়েন। তাঁর যে অর্থলিপ্সা ছিল না সেটার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। যতদূর মনে পরে ১৯৭৭ সালের কোনো সময়ে ওয়েবকুটার সমাবেশে আমি ও পীযূষবাবু হাজির ছিলুম। আর হাজির ছিলেন মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ইতিহাসের নামকরা পন্ডিত কিরণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়। উনি পীযূষবাবুকে দেখে এগিয়ে এসে বলেন যে, আপনার কলেজের কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে, আমরা সেটা ফেরত দিতে চাই। পীযূষবাবু সে টাকাটা নিতে অস্বীকার করেন, প্রস্তাব করেন টাকাটা কলেজের কোনো একটা Welfare fund-এ কাজে লাগাতে। পীযূষবাবু কোনো সময় স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলেন না। অনেক সময় অর্থকৃচ্ছতায় ভুগতেন। কিন্তু টাকার প্রতি লোভ তাঁর মধ্যে কোনো সময় আমার চোখে পড়েনি। অন্য দিকে টাকা পয়সার অভাবের দিনেও তাঁর আতিথেয়তার খামতি পড়ে নি।

পীযূষবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে একাধিক ক্ষেত্রে আমি তাঁর সহকর্মী ছিলুম। মনীন্দ্র কলেজের চাকরি যাবার পরে ইনি যতদূর মনে পড়ছে Education Mission নামে একটা Tutorial Home প্রতিষ্ঠা করেন। তার একটা কারণ ছিল সংসার চালানো। কিন্তু আরো একটা কারণ ছিল। সেটা ওঁর পড়ানোর তাগিদ। আমার জীবনে জাত মাষ্টার বলে যে কয়েকজনকে দেখেছি তার মধ্যে 'পীযূষবাবু' অন্যতম। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ছে — তিনি বিজয়গড় জ্যোতিষরায় কলেজের অধ্যক্ষ প্রয়াত অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। ছাত্রদের মধ্যে এরা ছিলেন ছোটখাটো দেবতা — ইংরেজিতে যাকে বলে Minor Legend। আমার শিক্ষক জীবনে Education Mission -এর স্মৃতি ভোলার নয়। অনেক মানুষের সঙ্গে ওখানে পরিচয় হয়। ছাত্রছাত্রীদের কথা বাদ দিলুম। মাঝে মাঝে তাঁদের কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়। পুরনো স্মৃতির কথা ওঠে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আবার দেখা হলো ওঁর স্মৃতিসভায়। পীযূষবাবু ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি তাঁরই আকর্ষণে ছাত্রছাত্রীরা আর বহু বন্ধু বান্ধব আসতো। রাজনীতির জরুরী প্রশ্ন, দেশের শিক্ষার হাল, এমনকি কারো কারোর পারিবারিক সমস্যাও আলোচনা হত। পিযূষবাবু সুরসিক রহস্য প্রিয় লোক। বেশ ভাল pun করতে পারতেন। তাঁর এই লোকপ্রিয় গুণের উজ্জ্বল পরিচয় পাই ঐ Tutorial Home -এর সন্ধ্যার আড্ডায়। ডাইরি রাখার অভ্যাস নেই। তাই আফশোষ হয়।

১৯৬৪ সালে Arrest এড়াবার জন্যে পীযূষবাবুকে Underground -এ যেতে হয়। তার ফলে Education Mission সঙ্কটে পড়ে। তখন বুঝতে পারি শিক্ষক হিসেবে, বহু লোকের আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর ভূমিকা। আমাদের ভূমিকা ছিল উপগ্রহের মতো।

Underground অবস্থায় পীযূষবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। শুনেছি যে পুলিশ আমাকে সন্দেহ করতো বাইরের জগতের সঙ্গে contact -এর মাধ্যম হিসেবে। অতএব ঝুঁকি ছিল। কিন্তু প্রয়োজনও ছিল। ১৯৪৮ - ৫০ সালেও কুরিয়ারের কাজ করেছি। কিন্তু তখন পার্টিকর্মী হিসাবে আমার বাইরে বিশেষ পরিচয় ছিল না। যাই হোক পুলিশের নজর এড়িয়ে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পীযূষবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

এছাড়া National Book Agency - র পরিচালক সমিতির সদস্য হিসেবে আর পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র People's Democracy তে এক সঙ্গে কাজ করেছি। অনুবাদের কাজ উনি চাইলে মাঝে মাঝে সহযোগিতা করেছি। ওরই উদ্যোগে কাকাবাবুর কিছু লেখা, বিশেষ করে তাঁর 'কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমার জীবন' ইংরেজিতে অনুবাদের কাজে হাত লাগাই। অনুবাদ কেমন হয়েছিল তা আমি বলতে পারব না। যাই হোক আমি যে অনুবাদ করতে পারি এই প্রত্যয় হতো না যদি পীযূষবাবু উদ্যোগ না নিতেন।

পীযূষবাবু মার্ক্সের নন্দনতত্ত্বের সম্পর্কে কয়েকটি লেখা অনুবাদ করেছিলেন - বোধ হয় সেটাই তার অনুবাদের শেষ কাজ। উনি নিজেই একাজ সহজেই করতে পারতেন। কিন্তু এই ব্যাপারে যে আমার সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন সেটা আমার গৌরব। বইটির কপি দেবেন বলেছিলেন। ঘটনাচক্রে বইটা অদেখা রয়ে গেছে।

কিন্তু Capital -এর অনুবাদ ওঁর সম্পূর্ণ একক কীর্ত্তি। দুঃসাহসিক কাজ বিশেষ করে একজন ব্যক্তির পক্ষে। ইংরেজি ও বাংলাভাষায় সমান দক্ষতা না থাকলে এই বৃহৎ ও জটিল গ্রন্থের অনুবাদ অসম্ভব। এই বিরল শক্তির অধিকারী পীযূষবাবু ছিলেন। [সবচেয়ে জটিল হচ্ছে Capital-এর তৃতীয় ভল্যুম - Theory of Surplus Value। আমার আজও ভাবতে অবাক লাগে কি করে উনি তৃতীয় ভল্যুমের অনুবাদ সম্পন্ন করলেন]। মার্ক্সবাদ - যা ওঁর আজীবন জীবনদর্শন ছিল — তার সেবায় এত বড় নৈবেদ্য আর কি হতে পারে ? প্রচন্ড ও দীর্ঘস্থায়ী Passion না থাকলে এই একক প্রচেষ্টা সফল হতে পারত না।

অনেকের কাছে পীযূষবাবুর পরিচিতি শিক্ষক ও রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা হিসাবে। এর আড়ালে তার আর একটা পরিচয় চাপা পড়ে গেছে - সেটা তাঁর সাহিত্যবোধ। তিনি আধুনিক উপন্যাসের আগ্রহী পাঠক ছিলেন। পাঠের ব্যাপারে ছুৎমার্গী ছিলেন না। ওঁর পরামর্শে আমি গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস পড়ি। শুনেছি সমরেশ বসু পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। পীযূষবাবুর সাহিত্য-প্রীতি আর সাহিত্য রুচির নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহ -'রবীন্দ্রনাথ অন্যচোখে' পীযূষবাবু আজীবন মার্কসবাদী ছিলেন। শুধু তত্ত্বজ্ঞানে নয় কাজেও। পার্টি ভাগ হবার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা কিছু কম ছিল না। এমন কি CPIM -এর সঙ্গে বিরোধের সময় তিনি মূল স্রোত থেকে বিচ্যুত হন নি। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের সময় অধ্যাপক সমিতির সমাবেশে বেশ কিছু পার্টি কর্মী

তাঁর কাছে জানাতে চায় তিনি পার্টির Tactical line সমর্থন করেন কিনা। তিনি খুব ধৈর্য্য ধরে পার্টির অবস্থানের সপক্ষে যে যুক্তি আছে তার চমৎকার ব্যাখ্যা করেন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমার কাছে চিঠি মারফৎ এখানকার পরিস্থিতির খবর জানাতে চাইতেন। পার্টি জেতার পর বাঙ্গালোর থেকে ট্রাঙ্ক কল করে তাঁর স্বস্তি প্রকাশ করেন।

পীযূষবাবু নেতাজিনগর কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। কলেজ গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকা কত বড় ছিল তার আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁর নিজের হাতে গড়া প্রাণস্বরূপ প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল কেন সেটার ব্যাখ্যা আমি জানি না। তাঁর বেদনার কিছু ভাগ আমি নিতে পেরেছিলুম সেটা গর্ব বলে মনে করি। যে সব প্রচার সেই সময় আমার কানে এসেছিল তার একটাও আমি বিশ্বাস করি নি। তাই যখন তিনি জীবিতকালে ন্যায়বিচার পেলেন আমি খুবই স্বস্তি বোধ করেছিলুম। George Eliot -এর উপন্যাসের নায়ক Silas Marner কে চুরির অপবাদে গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল। পরে জীবনে সার্থকতা লাভের পর অপবাদ থেকে মুক্তিলাভের আশায় ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়। কারণ, তার পরিচিত সকলেই মৃত। পীযূষবাবুকে এই Tragedy ভোগ করতে হয় নি। দেরিতে হলেও কলঙ্কমুক্ত হয়েছিলেন। যাঁদের প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছিল, পীযূষবাবুর শেষ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রায় পঞ্চাশ বছর পীযূষবাবুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। আজ মনে হয় তাঁর জীবনে মোটেই মসৃণ ছিল না। অনুকূল অবস্থার চেয়ে প্রতিকূলতা বেশি ছিল। সুযোগসন্ধানী হলে জীবনে হয়তো বাস্তব সাফল্য অর্জন করতে পারতেন। অন্ততঃ আরো কিছুদিন বাঁচতেন। কিন্তু শেষ জীবনের প্রায় অনেকটাই কেটেছে প্রতিকুলতার সঙ্গে লড়াই করে। তাছাড়া দুবার তিনি কঠিন রোগে ভুগেছিলেন। সব মিলিয়ে তার জীবনের তেজ কমে আসছিল। বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় যখন তিনি শেষবার আসেন তখন তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যেন তার pale ghost কে দেখছি. বাঙ্গালোরে ফিরে যাবার আগে আমার বাড়িতে অনুজ শঙ্কর দাশগুপ্তকে নিয়ে এসেছিলেন। আমার ভাই-বোনেদের সঙ্গে বেশি কথা হয়েছিল। যাবার সময় আমার হাত ধরে অনুনয়ের স্বরে বলেছিলেন 'প্রভাসদা শরীরের যত্ন নেবেন।' আমি বলেছিলুম, যম আমাকে এড়িয়ে চলছে — শরীরের যত্ন নেবার প্রয়োজন আপনার অনেক বেশি। তাঁর মৃত্যুর খবর শঙ্করবাবু যখন জানালেন তখন বিস্মিত হই নি — মনে হল আমার জীবনে একটা বড় অধ্যায় যাঁকে নিয়ে ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায় উৎকণ্ঠায় গড়ে উঠেছিল তার যবনিকা পড়ল।

পীযূষ দাশগুপ্তকে যেভাবে জেনেছি এবং দেখেছি

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

পীযূষদার মধ্যে আমি দেখেছি স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কি ভাবে একজনকে অন্তরঙ্গ করে নিতে পারতেন, আর দেখেছি তাঁর মধ্যে ভালবাসা ছিল সহজলভ্য। তিনি ভালবাসা দিতেন, ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহম্‌দ - এর খুব ঘনিষ্ঠ এবং ভালবাসার পাত্র। কাকাবাবুর ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য এবং ভালবাসা লাভের সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল, তা থেকেই আমি সেটা জেনেছিলাম।

পীযূষদার মধ্যে ছিল ভালোবাসার সঙ্গে পান্ডিত্য এবং কর্মোদ্যোগ। এই নিরহংকারী কর্মোদ্যোগী মানুষটির সঙ্গে বেশি করে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ আমার হয়েছিল বন্দী জীবনে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৯ সালের সেই রক্তাক্ত দিনগুলোর কথা আজ আমার মনে পড়ছে।

কারাগারে বন্দীদের প্রতি বাইরে থেকে কি নির্দেশ এসেছিল না এসেছিল অত সব আমি কিছু জানি না, আর আমার আজ মনেও নেই। তাছাড়া দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হবার সময় আমাকে যে ভাবে মারা হয়েছিল, বিশেষ করে মাথায় যার ফলে ২৪ ঘন্টার বেশি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম, তার জন্যে আজ পর্যন্ত অনেক কিছুই মনে করতে পারি না, বাল্যেরও অনেক স্মৃতি চিরতলে হারিয়ে গেছে। আমি ছিলাম কণিষ্ঠতম রাজবন্দী, তখনও আমার ২১ (একুশ) বছর পূর্ণ হতে কিছু বাকি। প্রেসিডেন্সি জেলে "সাত খাতায়" দোতলার একটা ঘরে আমাদের সভা হয়েছিল। সেখান থেকে জেনেছিলাম যে কতকগুলো দাবি - দাওয়ার ভিত্তিতে আমরা অনশন ধর্মঘট করতে যাচ্ছি, কারণ সরকার জানিয়ে দিয়েছে যে সেই দাবিগুলো তারা মানবে না। যতদূর মনে পড়ছে দাবিগুলোর মধ্যে ছিল দৈনিক খাবারের টাকার পরিমান বাড়ানো, চৌকায় (রান্নার জায়গা) নিজেদের (বন্দীদের) তত্ত্বাবধানে রান্না করতে দেওয়া, গরমের এবং শীতের জামা-কাপড়ের জন্যে প্রতি বন্দীর জন্যে টাকার বরাদ্দ এবং মাসিক ৪০ (চল্লিশ) টাকা হাত খরচা, সেই সঙ্গে জেলের মধ্যে একটা দোকানের ব্যবস্থা করা যেখান থেকে বন্দীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারেন।

যেদিন থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু হবে তার দু'দিন আগে বিকেলে মাঠ থেকে "সাত খাতায়" ফেরারপর পীযূষদা আমাকে ডাকলেন। সাতখাতার দোতলায় পশ্চিমমুখো যে ঘরটা, যার জানালার গরাদের সামনে দাঁড়ালে ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং ভবানী ভবনের সামনে দিয়ে যে বাস রাস্তাটা চলে গেছে সেটার কিছুটা দেখা যেত, সেই হল ঘরে জেল কমিটির নেতারা থাকতেন। পীযূষদাও সেখানেই থাকতেন। পাশের হল ঘরে অন্যদের সঙ্গে আমি থাকতাম, সেটা ছিল অনেক বড় ঘর এবং আমাদের যত মিটিং ঐ ঘরেই হত। দুটো ঘরের মধ্যে যাতায়াতের দরজা ছিল। পীযূষদা আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তিনি আমাকে তাঁর বিছানায় বসিয়ে বললেন,

"কৃষ্ণ তোমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হবে। আমার বিশ্বাস আছে সে দায়িত্ব তুমি পালন করতে পারবে।" তাঁর এই শেষের কথাটা বলার ভঙ্গিটা যে কি রকম ছিল সেটা যারা তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন। শ্রোতাকে তাঁর কথাটা যে কি ভাবে উদ্দীপিত করত সেটাও কেবল তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা তাঁর মুখ থেকে এই রকম কথার সম্মুখীন হয়েছেন। দয়িত্বটা শোনার আগেই যে আমি সেই দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম এটাই হল প্রকৃত সত্য।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি দায়িত্ব পীযূষদা ?"

তিনি বললেন, " তোমাকে অসুখের ভান করতে হবে। পায়খানা হচ্ছে, বমি হচ্ছে, পেটে অসহ্য ব্যথা !"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

তিনি বললেন, " আজকে না, কাল সকালে আমরা জেল অফিসে খবর পাঠাবো। অসুখের ভানটা তুমি করবে কাল সকাল থেকে।"

বিষয়টা তখনো আমার কাছে পরিষ্কার হল না, তাই আগের মতই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি এরপর বললেন, " পরশু থেকে আমরা অনশন শুরু করছি। অনশন শুরু করলেই জেল অফিস থেকে আমাদের খবরের কাগজ দেওয়া বন্ধ করে দেবে। রেডিওগুলো নিয়ে গেছে।"

সেইদিনই সকালে জেল সুপার এবং জেলার বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে যেখানে যা কিছু আছে সার্চ করে রেডিওগুলো নিয়ে গেছেন। এমন কি যেখানে আমরা পায়খানা করতাম সেখানে একটা খালি চৌকির উপুড় করে তার নিচে (সারি সারি সব টোকরি বসানো ছিল পায়খানা করার জন্যে) একটা রেডিও রাখা ছিল, সেটাও নিয়ে গেছেন।

পীযূষদা বললেন, "হাসপাতালে তোমাকে কাগজ দেবে, কারণ তুমি অনশন করছ না। তোমার কাজ হবে সকালে খবরের কাগজটা পাওয়া মাত্র আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেওয়া। সব চ্যানেল ঠিক করা আছে, একজন যাবে তোমার কাছে তার হাতে কাগজটা দিয়ে দেবে। দুপুরের দিকে আবার কাগজটা তোমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

এতক্ষণে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম এবং স্বভাবতই সম্মতি জানালাম।

পীযূষদা আরও বললেন, "শোনো, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে হাসপাতালের মধ্যেই একজন থাকবে, সে তোমার সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতে চাও তাহলে তাকে ব্যবহার করবে।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানানোর পর পীযূষদা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "যে গিয়ে কাগজ চাইবে তাকেই কাগজ দিয়ে দেবে তো ?"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে আবার তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। সেই রকম মুখে হাসি নিয়েই বললেন তিনি, "চ্যানেল নষ্ট হয়ে যাবে। যে কাগজ আনতে যাবে সে গিয়ে তোমার হাতে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো দেবে, তাতে বড় হাতে " P " লেখা থাকবে। সেইটা হাতে পেয়ে তবে তুমি কাগজ দেবে।"

সাতখাতা থেকে হাসপাতাল, সঠিক মনে নেই, তবে ৫ টা থেকে ৬ টা গেট। প্রত্যোকটা গেট বন্ধ করে সিপাই চাবি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। যে কাগজ নিতে আসবে সে ঐ গেটগুলো পেরিয়ে আসবে এবং আবার ঐ গেটগুলো পেরিয়ে যাবে। প্রত্যেক দিন যে একই লোক আসতে পারে না এটা আমার মাথায় আসেনি, তাছাড়া কোন রকম সন্দেহ হলে যে জেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের একটা লোক আমার কাছে কাগজ নেবার জন্যে পাঠিয়ে বিষয়টা জানার চেষ্টা করতে পারে এটা তো খুবই স্বাভাবিক।

পরের দিন পরিকল্পনা কার্যকরী হল। বার বার তাগাদা দিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে আসা হল। আমার মুখ চোখ এবং অসাড় চেহারা দেখে ও পীযূষদাদের বর্ণনা শুনে, সেই সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জোরালো দাবি তোলাতে ডাক্তার আমাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

এর পর অনশন শুরু হল। কয়েকটা দিন কাগজ পাঠানোর যেমন ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ভাবে চলতে লাগল। এঠাৎ একদিন সকাল ৬-৩০ মিঃ নাগাদ আমার হাতে "আনন্দবাজার পত্রিকা" এসে পৌঁছল। অনশনরত রাজবন্দীদের দাবির সমর্থনে বৌবাজার স্ট্রিটে মহিলাদের শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। পুলিশ শোভাযাত্রার উপরে গুলি চালিয়েছে। লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া, গীতা মারা গেছেন। পুরো নাম, লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয়া দত্ত, গীতা সরকার। বন্দীদের সমর্থনে এই শোভাযাত্রা, তার উপরে গুলি এবং চার মহিলার মৃত্যু সংবাদ প্রথম পাতায় দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সাত খাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে হাসপাতালের মধ্যে যার সঙ্গে আমার চ্যানেল তৈরি হয়েছিল, ছুটে গেলাম তার কাছে। বললাম, এখনই খবরের কাগজখানা সাত খাতায় পৌঁছে দিতে হবে। ব্যবস্থা হয়ে গেল। পরে আমি যা খবর পেয়েছিলাম তা হল কাগজ সাতটার মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং কাগজ পাওয়া পর ক্ষিপ্ত রাজবন্দীরা পোস্টার লিখে একতলার দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে দোতলার সিঁড়ির মুখে লোহার খাট দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করেছিলেন এবং থালা-গেলাস-প্লেট-কাপ ইত্যাদি মারণাস্ত্রগুলো সেখানে জমা করেছিলেন। বেলা আটটার সময় যখন জেলার সাহেব জেল-ওয়ার্ডারদের বাহিনী নিয়ে ওয়ার্ড পরিদর্শনে এলেন, পরিদর্শন মানে সার্চ বা খানাতল্লাশি, তখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে আচমকা তাঁদের উপরে থালা-গেলাস-কাপ-ডিশ এসে পড়তে লাগল। হতভম্ভ জেলার এবং ওয়ার্ডাররা পালিয়ে জেল অফিসে ফিরে গেলেন।

বেলা ৯টা বাজবার কিছু আগে আমার কাছে খবর এল যে জেল-অফিস থেকে আমার কাছে লোক আসছে। আমি সতর্ক হলাম এবং কি করে যে মাথায় বুদ্ধিটা এল জানি না, আগের দিনের "আনন্দবাজার পত্রিকাটা" খাটের উপরে বিছিয়ে পড়তে শুরু করলাম। একটু পরেই জেল অফিস থেকে একজন ওয়ার্ডার এসে বলল, "জেলার সাহেব খবরের কাগজটা ফেরত চেয়ে পাঠিয়েছেন।" আমি কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকে বললাম, "হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে সবে কাগজটা দেখতে বসেছি। এখনই কাগজ দেব কি করে। জেলার সাহেবকে গিয়ে বল, এক ঘন্টা পরে যেন লোক পাঠান। তখন আমি কাগজ দিয়ে দেব।" ওয়ার্ডারটা অবাঙালী ছিল, আমি যে কবেকার কাগজ পড়ছি সেটা দেখার ক্ষমতা তার ছিল না এবং দেখতে চাইনও না। মনে হল সে সন্তুষ্ট হয়েই চলে গেল। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা চিরকুটে দু চার লাইনে পীযূষদাকে ব্যাপারটা লিখে একতলায় ছুটে গেলাম (আমি দোতলায় থাকতাম), ভাগ্যভালো, কন্‌ট্যাক্ট-ম্যানকে সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেলাম। তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে বললাম, " এই চিঠিটা নিয়ে যাও এবং এখ্‌খুনই খবরের কাগজটা এনে দাও, আমি এক ঘন্টা সময় নিয়েছি।"

ঠিক এক ঘন্টা পরে জেলারের কাছ থেকে আবার লোক এল এবং কাগজ তখন আমার হাতে এসে গেছে। ততক্ষণে সেদিনের খবরের উপর দিয়ে আমি একটু চোখ বুলিয়েও নিয়েছি।

বৌবাজারের ঘটনার পরে সরকার রাজবন্দীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন এবং আমার ঠিক মনে নেই, তবে মনে হয় আরও চার-পাঁচ দিন অনশন ধর্মঘট চলেছিল, তার পর সরকার থেকে দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ায় অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জেলের মধ্যে এটা ছিল প্রথম অনশন ধর্মঘট। যতদূর মনে করতে পারছি এই অনশন ১০ দিন চলেছিল।

এর পরে আমি জেলের মধ্যে আর একটি অনশন ধর্মঘটের কথায় যাচ্ছি। সেই অনশন চলেছিল ৫৬ (ছাপ্পান্ন) দিন।

অল্প কিছুদিন পরেই, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে প্রচন্ড মার খেয়ে কাশীপুর শ্রমিক অঞ্চল থেকে আমি বরানগর হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় নীত হই। ঐ হাসপাতালে ২৪ ঘন্টার উপরে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তারপর জ্ঞান ফিরলে আমাকে লর্ড সিংহ রোড ঘুরিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার অবস্থা দেখে লর্ড সিংহ রোডে আর কিছু অত্যাচার করা হয়নি, কারণ আমি কোন প্রশ্নের জবাব দিতে চাইছিলাম না এবং মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারাচ্ছিলাম। প্রেসিডেন্সি জেলে আমাকে জেল অফিস থেকে সেই 'সাত-খাতাতেই" নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পৌঁছে দেখলাম কেউ নেই, নিচের একটা একতলার ঘরের দরজার কাছে আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হল, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পীযূষদা। আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন, এ কী ! আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি ঘরে নিয়ে গেলেন। গায়ের জামা-কাপড় রক্তে ভেজা, মাথার ব্যান্ডেজ থেকে লাল জল মেলানো রক্ত চুইয়ে চুইয়ে মুখ-কপাল-ঘাড় বেয়ে নামছে যারা আমাকে নিয়ে এসেছিল তাদের মারফৎই তিনি জেল-অফিসে খবর পাঠালেন ডাক্তার পাঠাবার জন্যে বলা বাহুল্য ডাক্তার

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানানোর পর পীযূষদা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "যে গিয়ে কাগজ চাইবে তাকেই কাগজ দিয়ে দেবে তো ?"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে আবার তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। সেই রকম মুখে হাসি নিয়েই বললেন তিনি, "চ্যানেল নষ্ট হয়ে যাবে। যে কাগজ আনতে যাবে সে গিয়ে তোমার হাতে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো দেবে, তাতে বড় হাতে " P " লেখা থাকবে। সেইটা হাতে পেয়ে তবে তুমি কাগজ দেবে।"

সাতখাতা থেকে হাসপাতাল, সঠিক মনে নেই, তবে ৫ টা থেকে ৬ টা গেট। প্রত্যেকটা গেট বন্ধ করে সিপাই চাবি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। যে কাগজ নিতে আসবে সে ঐ গেটগুলো পেরিয়ে আসবে এবং আবার ঐ গেটগুলো পেরিয়ে যাবে। প্রত্যেক দিন যে একই লোক আসতে পারে না এটা আমার মাথায় আসেনি, তাছাড়া কোন রকম সন্দেহ হলে যে জেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের একটা লোক আমার কাছে কাগজ নেবার জন্যে পাঠিয়ে বিষয়টা জানার চেষ্টা করতে পারে এটা তো খুবই স্বাভাবিক।

পরের দিন পরিকল্পনা কার্যকরী হল। বার বার তাগাদা দিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে আসা হল। আমাব মুখ চোখ এবং অসাড় চেহারা দেখে ও পীযূষদাদের বর্ণনা শুনে, সেই সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জোরালো দাবি তোলাতে ডাক্তার আমাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

এর পর অনশন শুরু হল। কয়েকটা দিন কাগজ পাঠানোর যেমন ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ভাবে চলতে লাগল। এঠাৎ একদিন সকাল ৬-৩০ মিঃ নাগাদ আমার হাতে "আন্দবাজার পত্রিকা" এসে পৌছল। অনশনরত রাজবন্দীদের দাবির সমর্থনে বৌবাজার স্ট্রিটে মহিলাদের শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। পুলিশ শোভাযাত্রার উপরে গুলি চালিয়েছে। লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া, গীতা মারা গেছেন। পুরো নাম, লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয়া দত্ত, গীতা সরকার। বন্দীদের সমর্থনে এই শোভাযাত্রা, তার উপরে গুলি এবং চার মহিলার মৃত্যু সংবাদ প্রথম পাতায় দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সাত খাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে হাসপাতালের মধ্যে যার সঙ্গে আমার চ্যানেল তৈরি হয়েছিল, ছুটে গেলাম তার কাছে। বললাম, এখনই খবরের কাগজখানা সাত খাতায় পৌঁছে দিতে হবে। ব্যবস্থা হয়ে গেল। পরে আমি যা খবর পেয়েছিলাম তা হল কাগজ সাতটার মধ্যেই পৌছে গিয়েছিল এবং কাগজ পাওয়া পর ক্ষিপ্ত রাজবন্দীরা পোস্টার লিখে একতলার দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে দোতলার সিঁড়ির মুখে লোহার খাট দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করেছিলেন এবং থালা-গেলাস-প্লেট-কাপ ইত্যাদি মারণাস্ত্রগুলো সেখানে জমা করেছিলেন। বেলা আটটার সময় যখন জেলার সাহেব জেল-ওয়ার্ডারদের বাহিনী নিয়ে ওয়ার্ড পরিদর্শনে এলেন, পরিদর্শন মানে সার্চ বা খানাতল্লাশি, তখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে আচমকা তাঁদের উপরে থালা-গেলাস-কাপ-ডিশ এসে পড়তে লাগল। হতভম্ভ জেলার এবং ওয়ার্ডাররা পালিয়ে জেল অফিসে ফিরে গেলেন।

বেলা ৯টা বাজবার কিছু আগে আমার কাছে খবর এল যে জেল-অফিস থেকে আমার কাছে লোক আসছে। আমি সতর্ক হলাম এবং কি করে যে মাথায় বুদ্ধিটা এল জানি না, আগের দিনের "আনন্দবাজার পত্রিকাটা" খাটের উপরে বিছিয়ে পড়তে শুরু করলাম। একটু পরেই জেল অফিস থেকে একজন ওয়ার্ডার এসে বলল, "জেলার সাহেব খবরের কাগজটা ফেরত চেয়ে পাঠিয়েছেন।" আমি কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকে বললাম, "হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে সবে কাগজটা দেখতে বসেছি। এখনই কাগজ দেব কি করে। জেলার সাহেবকে গিয়ে বল, এক ঘন্টা পরে যেন লোক পাঠান। তখন আমি কাগজ দিয়ে দেব।" ওয়ার্ডারটা অবাঙালী ছিল, আমি যে কবেকার কাগজ পড়ছি সেটা দেখার ক্ষমতা তার ছিল না এবং দেখতে চাইলও না। মনে হল সে সন্তুষ্ট হয়েই চলে গেল। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা চিরকুটে দু চার লাইনে পীযুষদাকে ব্যাপারটা লিখে একতলায় ছুটে গেলাম (আমি দোতলায় থাকতাম), ভাগ্যভালো, কন্‌টাক্‌ট-ম্যানকে সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেলাম। তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে বললাম, " এই চিঠিটা নিয়ে যাও এবং এখ্‌খুনই খবরের কাগজটা এনে দাও, আমি এক ঘন্টা সময় নিয়েছি।"

ঠিক এক ঘন্টা পরে জেলারের কাছ থেকে আবার লোক এল এবং কাগজ তখন আমার হাতে এসে গেছে। ততক্ষণে সেদিনের খবরের উপর দিয়ে আমি একটু চোখ বুলিয়েও নিয়েছি।

বৌবাজারের ঘটনার পরে সরকার রাজবন্দীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন এবং আমার ঠিক মনে নেই, তবে মনে হয় আরও চার-পাঁচ দিন অনশন ধর্মঘট চলেছিল, তার পর সরকার থেকে দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ায় অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জেলের মধ্যে এটা ছিল প্রথম অনশন ধর্মঘট। যতদূর মনে করতে পারছি এই অনশন ১০ দিন চলেছিল।

এর পরে আমি জেলের মধ্যে আর একটি অনশন ধর্মঘটের কথায় যাচ্ছি। সেই অনশন চলেছিল ৫৬ (ছাপ্পান্ন) দিন।

অল্প কিছুদিন পরেই, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে প্রচন্ড মার খেয়ে কাশীপুর শ্রমিক অঞ্চল থেকে আমি বরানগর হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় নীত হই। ঐ হাসপাতালে ২৪ ঘন্টার উপরে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তারপর জ্ঞান ফিরলে আমাকে লর্ড সিংহ রোড ঘুরিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার অবস্থা দেখে লর্ড সিংহ রোডে আর কিছু অত্যাচার করা হয়নি, কারণ আমি কোন প্রশ্নের জবাব দিতে চাইছিলাম না এবং মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারাচ্ছিলাম। প্রেসিডেন্সি জেলে আমাকে জেল অফিস থেকে সেই "সাত-খাতাতেই" নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পৌঁছে দেখলাম কেউ নেই, নিচের একটা একতলার ঘরের দরজার কাছে আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হল, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পীযূষদা। আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন, এ কী ! আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি ঘরে নিয়ে গেলেন। গায়ের জামা-কাপড় রক্তে ভেজা, মাথার ব্যান্ডেজ থেকে লাল জল মেলানো রক্ত চুইয়ে চুইয়ে মুখ-কপাল-ঘাড় বেয়ে নামছে যারা আমাকে নিয়ে এসেছিল তাদের মারফতেই তিনি জেল-অফিসে খবর পাঠালেন ডাক্তার পাঠাবার জন্যে বলা বাহুল্য ডাক্তার

আসেনি। এর আগের বার বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতায় জানতাম রাজবন্দীরা ফার্স্ট-এইড্ বা প্রাথমিক চিকিৎসার সমস্ত বন্দোবস্ত নিজেদের কাছে রাখতেন। এবারও দেখলাম সে ব্যবস্থা আছে। পীযূষদা স্টোভ জ্বেলে জল ফুটিয়ে শুশ্রূষার যা যা ব্যবস্থা তা করলেন তারপর আমার রক্তমাখা জামাটা ছাড়িয়ে দিয়ে ওরই একটা কি যেন পরিয়ে দিলেন।

কিন্তু ঘরে একা শুধু পীযূষদা কেন? তার উত্তর দেরিতে হলেও পেলাম। আমি তাঁকে নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। পীযূষদা বললেন, অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছে, সকলকেই Segregation -এ নিয়ে গেছে, আমাকেও কাল নিয়ে যাবে। এর আগের বার যে অনশন ধর্মঘট দেখেছিলাম তাতে এই Segregation -এর ব্যাপারটা দেখিনি, সকলেই সাত-খাতাতেই ছিলেন। বিষয়টা নিয়ে পীযূষদাকে আমি আর কোন প্রশ্ন করিনি। পীযূষদার কাছ থেকে সেদিন যে সেবা পেয়েছিলাম কোনদিন তা ভুলতে পারবো না। রাতে আমার খাবারের order তিনি যখন দিলেন তখন বেশি করে দুধ দিতে বললেন। তাঁর সেবার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমি লেখা ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তবে নিজের লোহার খাটটা আমার মাথার কাছে টেনে এনে মনে হয় তিনি সারা রাত জেগেই কাটিয়েছিলেন। পরদিন সকাল থেকে তিনি আবার আমাকেই নিয়েই পড়ে রইলেন। জেল অফিসে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, শেষ পর্যন্ত প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ ডাক্তার এলেন। ব্যান্ডেজ খুলে দেখেশুনে, আমাকে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, " ভয়ের কিছু নেই, স্টিচ্ সব দেওয়া আছে।" সঙ্গের ওয়ার্ডারকে হাসপাতালে পাঠালেন ব্যান্ডেজের কাপড় এবং যে ওষুধ লিখে দিলেন সেগুলো আনতে। আমি আমার ঐ সময়কার জেল-জীবনে (প্রায় তিন বছর) এটা দেখেছি যে ডাক্তাররা আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন।

ডাক্তার চলে গেলে পীযূষদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি করব, তোমাকে এইভাবে রেখে আমি চলে যাবো ?" তারপর নিজের মনে বললেন, "ওরা তো আমাকে আর এখানে রাখতে চাইবে না।" পীযূষদা নিজেও অনশন করে ছিলেন। জেল-অফিস থেকে কখন তাকে নিতে আসবে এই আশঙ্কা তিনি সব সময় করছিলেন। হঠাৎ তিনি একটা আবেদন পাঠালেন যে আমি যেভাবে আহত এবং অসুস্থ অবস্থায় আছি তাতে তাঁকে যেন সেদিনই Segregation -এ না নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জেল-অফিস থেকে একটা জবাব এল যে একটা দিনের জন্যে তাঁর Segregation রদ করা হল।

পরদিন সকালে খবর এল যে বেলা ১০ টার সময় পীযূষদাকে Segregation-এ নিয়ে যাওয়া হবে। পীযূষদা তাড়াতাড়ি লেগে গেলেন আমার সব বন্দোবস্তগুলো করে দিয়ে যেতে। কালতুকে ডেকে (রাজবন্দীদের দেখাশুনা ও তাঁদের কাজ করে দেবার জন্যে সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের নিয়োগ করা হত) কত কি নির্দেশ দিলেন, ঔষধপত্র সম্বন্ধে তাকে যেমন বললেন তেমনি আমাকেও বললেন। তারপর খবর দিয়ে একজন ওয়ার্ডারকে ডেকে নিয়ে এলেন, কালতুকে বললেন, তেমন যদি কোন প্রয়োজন বোধ হয় তবে তাকে ডেকে বলে দিলেই তিনি খবর পেয়ে যাবেন।

ঠিক দশটায় জেল-অফিস থেকে লোক এসে গেল। যাবার সময় পীযূষদা আমার একখানা হাত চেপে ধরে বললেন, "কৃষ্ণ, ভয় পেয়ো না। মনে সাহস রাখো।"

পীযূষদার কাছ থেকে আমি জেনে রেখেছিলাম যে ওষুধের মধ্যে Purgative আছে কিনা। তিনি বলেছিলেন আছে এবং দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি যাবার আগেই আমি মনস্থির করেছিলাম যে আমিও অনশনে যোগ দেব। আন্দামান বন্দী বিপ্লবী গণেশ ঘোষ আমাদের শিখিয়েছিলেন যে অনশন শুরু করার আগে, আগের দিন খাওয়া বন্ধ করে Purgative খেতে হবে এবং পেটে একটুও Stool থাকবে না এমন ভাবে অনশন শুরু করতে হবে। তা না হলে সামান্যও যদি থাকে তবে সেটা পেটে বুলেটের কাজ করবে, সেটা হবে খুবই বিপজ্জনক।

পীযূষদা চলে গেলেন। আমি একা, রাতের জন্যে নতুন ফালতু এলো, আগের জন তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেল। পরের দিন থেকে আমার প্রস্তুতি শুরু হল। ডাক্তার সেদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বারোটা নাগাদ এলেন। আমি আমার মনোভাব জানালাম। তিনি সব পরীক্ষা করে বললেন, "সব ঠিক আছে। ওষুধগুলো খাবেন" আরও একটা ওষুধ লিখলেন, সেটা হাসপাতাল থেকে আনাবার ব্যবস্থা হল। দিনে যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করলাম। রাতের জন্যে খাবারের অর্ডার দিলাম না। খাওয়া বন্ধ করে Purgative খেলাম। পরদিন থেকে অনশন। সেদিন ঐ ভাবেই থাকলাম। রাত পোয়ানে নতুন দিনটা কেমন যাবে ভাবছি, জেল-অফিস থেকে খবর এল বেলা দশটায় তৈরী হয়ে থাকতে হবে Segregati on -এ যাবার জন্যে। যেখানে আমাকে নিয়ে গেল সেখানে পীযূষদাও রয়েছেন দেখলাম। লম্বা টিনের ছাউনি দেওয়া "শিবির" এর মত ঘর, তিন ফিট চওড়া সাত ফিট লম্বা পাশাপাশি প্রায় চল্লিশটা ঘর তার দিয়ে ঘেরা, ঢুকবার গেটটাও তারের, ছাউনিটাও তারের । এক একটা তারের খাঁচা, কে কোথায় আছে সকলে সকলকে দেখতে পাচ্ছে, তবে প্রত্যেকেই তালাবন্দী। পীযূষদা জিজ্ঞেস করলেন, "কৃষ্ণ, চলে এলে ?" বললাম, "হ্যাঁ পীযূষদা, চলে এলাম।" আরও ৫২ দিন ধরে সেখানে কি হয়েছিল সে বর্ণনার জন্যে এ লেখা নয়। বন্দীরা মোট ৫৬ দিন অনশন ধর্মঘট চালানোর পর অনশন তুলে নিয়ে যেদিন সকলে সাত-খাতায় ফিরে এলাম সেদিনের কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। সমস্ত দিন ডাক্তারের নির্দেশে শক্ত খাবার কাউকে খেতে দেওয়া হয়নি, সব খাবার সরবত জাতীয়, রাতেও তাই। তার পরিণাম? ভয়াবহ। ওয়ার্ডগুলোতে কড়িবর্গার নিচে রাত্রে অনেক গোলা পায়রা থাকতো। গভীর রাতে কিছু বন্দীরা উঠে সেই পায়রাগুলো ধরে পালক ইত্যাদি ছাড়িয়ে মাংস পুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙে শুনলাম পীযূষদা খুব চেঁচামেচি করছেন। পরে কারণটা জানতে পারলাম। পীযূষদা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কৃষ্ণ, তুমি খাওনি তো ?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি জানিই না কিছু।"

পীযূষদার সম্পর্কে অনেক কিছু বলার থাকলেও আমি জেলের কিছু স্মৃতির উল্লেখ করে

বক্তব্য শেষ করলাম। মানুষটাকে জানতে আমার এই স্মৃতিচারণ অনেকটা সাহায্য করবে। জেলের ভেতরে এবং বাইরেও পীযূষদার নেওয়া মার্কসবাদের ক্লাসে উপস্থিত থেকেছি, ঐ ভাবের বক্তব্য আর কেউ ক্লাসে রাখতে পেরেছেন বা পারেন বলা হলে আমি তা স্বীকার করব না, আমার অভিজ্ঞতা ১৯৪২ থেকে এই ২০০২ — তার উপরে দাঁড়িয়ে আমি এই কথা বলছি। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষ জানেন, সে সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই। সব শেষে বলব, পরিণত বয়সে, জীবনের শেষ দিকে যে বেদনা তিনি সহ্য করেছেন সেই বেদনা আমার বুকেও তাঁর জন্যে ছিল, আছে এবং থাকবে।

পীযূষদাকে ফিরে দেখা

অমলেন্দু দে

মাদারীপুর শহরে ফৌজদারী পাড়ায় পীযূষদার মামা বাড়ি ছিল। আমরা ছিলাম প্রতিবেশী। অবিভক্ত বাংলায় তাঁর বাবা সরকারী কাজে পরিবারের সবাইকে নিয়ে ফরিদপুর শহরে থাকতেন। পূজোর ছুটিতে পীযূষদা, মৃণালদা, শংকর ও মীরাদি তাঁদের বাবা মায়ের সঙ্গে মামা বাড়িতে আসতেন। শংকর আমার বয়সী। স্বভাবতই ওর সঙ্গেই ছিল আমার অন্তরঙ্গতা। বয়সে ছোট সকলের কাছেই পীযূষ দাশগুপ্ত ছিলেন পীযূষদা। আমরা শুনতে পেলাম, কলকাতাতে পড়াশুনার সময়েই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। তাঁরই প্রভাবে মৃণালদাও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। আন্দামানে বন্দীজীবন যাপন করার পরে মুক্তিলাভ করে যাঁরা মাদারীপুর শহরে ফিরে এলেন তাঁরাই এখানে এবং ফরিদপুর জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উদ্যোগী হন। ফৌজদারী পাড়া ছিল মাদারীপুর শহরের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম কেন্দ্র। এখানে একটি পার্টির কমিউন, মার্কসিস্ট গ্রন্থাগার ও ইটের পুলের লাগোয়া পার্টি অফিস ছিল। নিয়মিত পার্টির ক্লাস হত ও হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা বের হত। পার্টির ক্লাসে মার্কসবাদ, ভারতীয় সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতীয় ও বিশ্ব অর্থনীতি, সোভিয়েত ও চীন বিপ্লব, ভারতের জাতি সমস্যা ও পাকিস্তান প্রস্তাব ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জেলা পার্টির নেতারা আলোচনা করতেন। তাছাড়া পার্টির ঘনিষ্ট চিকিৎসকরা শারীর বিদ্যা, ফার্স্ট এইড, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি বিষয়ে ক্লাস নিয়ে পার্টি কর্মীদের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করতেন। মানচিত্র সহকারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঘটনাবলী পার্টির নেতারা আলোচনা করতেন। ডাক্তাররা তাঁদের আলোচনায় শারীর বিদ্যা সম্পর্কীয় চার্ট ব্যবহার করতেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে বহু বিড়ি তৈরির কারিগর, ক্ষৌরকার ও অন্যান্য শ্রমজীবী অংশের পার্টি কর্মীরা এই ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিপদ পাটনি নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষদের পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করেন। অকালে তাঁর প্রয়ান ঘটায় তাঁর নামেই ‘হরিপদ স্মৃতি পাঠাগার’ নামক মার্কসবাদী পাঠাগার পার্টি কমিউনের কাছে এক পৃথক বাড়িতে গড়ে তোলা হয়। ফরিদপুর জেলার প্রথম মার্কসবাদী পাঠাগার।

পীযূষদা মাদারীপুর এলে তিনিও নিয়মিত পার্টির ক্লাস নিতেন। সক্রিয়ভাবে কিশোর বাহিনী ও ছাত্র ফেডারেশণের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমার মত কয়েকজনের পার্টির ক্লাসে যোগদানের সুযোগ ঘটে। মার্কসবাদের প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করাই ছিল পার্টি নেতাদের উদ্দেশ্য। পীযূষদা সাধারনত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি নিয়েই ক্লাস নিতেন। কলকাতার পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকায় তিনি মাঝে মাঝে কলকাতার রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও বলতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রয়াত হন তখন বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে পীযূষ দাশগুপ্ত ও অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য মালা দিয়ে কবির প্রতি পার্টির শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই দুজন ছাত্র নেতাই ছিলেন ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা। তাঁদের জন্য আমাদের গর্বের ভাবও ছিল

অমিত সেন লিখিত 'ইতিহাসের ধারা' নামক গ্রন্থ অবলম্বন করেই পীযূষদা ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করতেন। অমিত সেন এই ছদ্মনামেই যে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার লিখতেন তা আমরা তাঁর কাছেই শুনতে পাই। পরে যখন অমিত সেন রচিত Notes on the Bengal Renaissance গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখনও পীযূষদা এই গ্রন্থের সাহায্যে দুটি কি তিনটি ক্লাস নিয়েছিলেন। পীযূষদা মাদারীপুরে 'সংস্কৃতি সভায়ন' নামে একটি বড় সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করে এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনও সংগঠিত করেন। আমরা অনেকেই সক্রিয়ভাবে তাঁর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাদের চিন্তাকে ব্যাপ্ত করেন। যখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি তখনই আমি 'তিন অধ্যায়' নামে একটি নাটক লিখে পরবর্তীকালের বিশিষ্ট সাংবাদিক রণজিৎ রায়দের বাড়ির বড় প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করি। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে লেখা এই নাটকে তীব্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য ছিল। আমরা ছেলেমেয়েরা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করি। প্রথম দিন নাটকটি যথেষ্ট জনসমাগমের মধ্যেই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে নাটক মঞ্চস্থ করার সময়েই পুলিশ এসে বাধা দিল। নির্দেশ জারি হল, 'এই নাটক করা চলবে না'। আমাদের বয়সের কথা ভেবে কাউকে গ্রেফতার করা না হলেও পুলিশ আমার বাবাকে অভিযোগ জানায় এবং আমাকে সতর্ক হতে বলে। পীযূষদা এই খবর পেয়ে আমাকে খুবই তারিফ করে বলেন, 'বড়খোকা', তুই তো আমাদের অবাক করে দিয়েছিস। লিখতে থাক. আমার ডাক নাম ছিল বড়খোকা। পীযূষদা এই নামেই আমাকে ডাকতেন।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে এলাম। কয়েকমাসের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ সমগ্র পরিস্থিতিকে পালটে দিল। কলকাতায় ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হিসেবে ছাত্র ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লাম। পীযূষদার সঙ্গে মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে দেখা হয় ও কথা বার্তা হয়। ফরিদপুর জেলার পার্টির সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা তিনি ও রনজিৎ রায় জানতেন। রনজিৎ রায় ফরিদপুর জেলার পার্টিকে মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্যও করতেন। পূর্ব পাকিস্তানে পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় পার্টি নেতারা আত্মগোপন করেই ছিলেন। দেশভাগের ফলে আমিও আমার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। বাবার সঙ্গে যোগাযোগ শুধু পত্রের মাধ্যমে। রাজনৈতিক কারণে এক অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তৈরি হল। কলকাতায় এক নোঙরহীন ছাত্র হিসেবে আমার জীবনের এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামের জীবনের সূচনা হল। তার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় মনে ছিল অদম্য সাহস। স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনা করার সুযোগ আমার না থাকলেও তার মধ্যেই চলতে থাকলাম। বি.এ. পড়ার সময়েই 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার আমার দুটো নিবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। একটি হল কাডি শ প্রসঙ্গে, আর একটি এরিখ মারিয়া রেমার্ক সম্বন্ধে। পীযূষদা এই দুটো নিবন্ধ পড়ে আমাকে খুবই উৎসাহিত করেন।

মৃণালদা প্রয়াত হওয়ায় পীযূষদাদের বাড়িতে এক মহাবিপর্যয় ঘটল। এমন তরতাজা মানুষটি যেভাবে অসুস্থ হয়ে চলে গেলেন তাতে আমরা খুবই বিপন্ন বোধ করেছি। পীযূষদার

মুখটি এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পীযূষদা মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে যে আড্ডার আসর বসাতেন তাতে অনেকেই আসতেন। তাতে আমারও যোগদানের সুযোগ ঘটে। মনে পড়ে পীযূষদার ছোট ভাই বাসব দাশগুপ্ত কোন একটি দৈনিক কাগজে একটি নিবন্ধে এই আড্ডার বিষয়ে উল্লেখ করেন। ইতিমধ্যে আমিও কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। কার্যকরী সমিতির একজন যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। এখানেও তাঁর সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ ঘটে। তাঁকে কেন্দ্র করে মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গনে অধ্যাপকদের অনশনের সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিত আলোচনা হত। একই পার্টির অন্তর্ভূক্ত হলেও শিক্ষক সমিতির নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে পীযূষদার মত পার্থক্য তীব্র হয়। তাঁর ভূমিকাকে সমালোচনা করে 'পীযূষবাদ' বলে উল্লেখ করা হয়। এই মতপার্থক্য সংগঠনে যে জটিলতার সৃষ্টি করে তাতে আমার মত কয়েকজন বেশ বিব্রত বোধ করি।

পার্টিতে পীযূষদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি নিয়মিত পার্টির ক্লাস নিতেন। শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে গ্রামাঞ্চলেও তিনি ক্লাস নিতে যেতেন। একবার মেদিনীপুরের একটি গ্রামে একটি আলোচনা সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই বিষয়ে খবর পেলাম। তখন পীযূষদা আর পার্টি সংগঠনে নেই। আমার বক্তৃতার কথা শুনে একজন অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী দেখা করতে এলেন। অধ্যাপক পার্টির সদস্য। তিনি পীযূষদার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেন, "তখন তো যাতায়াতের পথ এতটা সুগম হয়নি। তা সত্ত্বেও কষ্ট করে পীযূষদা নিয়মিত এই গ্রামে এসে আমাদের ক্লাস নিতেন। তাঁর ক্লাস করেই আমি পার্টিতে আসি। আমার মত আরও কয়েকজন পার্টি সদস্য হন।" পীযূষদা সম্বন্ধে এমনি আরও অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমি শুনেছি।

বহু বছর আগে আমি যখন বাঘাযতীন অঞ্চলের বাসিন্দা হলাম পীযূষদা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। এই সময়ে আমি ফরিদপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস লিখবার পরিকল্পনা করি। পীযূষদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করে রাখি। ফরিদপুর জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে যখন তথ্য সংগ্রহ করার কাজ করি তখন অধ্যাপক কে. এন. পানিক্কর-এর কাছ থেকে একটি অনুরোধ এলো। তিনি কেরালার কমিউনিস্ট নেতা কে. দামোদরণ-এর স্মরণে National and Left Movements In India গ্রন্থ সম্পাদনার পরিকল্পনা করে আমাকে একটি প্রবন্ধ পাঠাতে বলেন। আমি তাঁকে Formation of Communist Party in Faridpur : A Case Study of Communist Movement in a Bengal District নামক গবেষণা প্রবন্ধ পাঠাই। তিনি খুবই খুশি হয়ে এই প্রবন্ধটি তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৮০ সালে প্রকাশ করেন ২০০১ সালের ১০ মার্চ এই প্রবন্ধটি একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ রচনায় পীযূষদার সাক্ষাৎকার খুবই কাজে লাগে। তাঁকে ব্যাঙ্গালোরে এই পুস্তিকার একটি কপি পাঠালে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে আমাকে একটি চিঠি দেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁর প্রয়াণের খবর আমরা পেলাম।

তাঁর সঙ্গে আমার যে সব কথাবার্তা হত তাতে তিনি পার্টিতে স্থান পাবার আগ্রহ মাঝে মাঝেই ব্যক্ত করতেন। এমন একজন আত্মত্যাগী সুদক্ষ সংগঠক ও মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ, যিনি জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পার্টির দায়িত্ব পালন করেন, তাঁকে এই ভাবে অবহেলিত অবস্থায় পার্টির বাইরে কেন থাকতে হবে, তা আমার উপলব্ধির বাইরে ছিল। পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় পীযূষদা গভীর বেদনা অনুভব করেন। এখন সে কথা ভাবতে গেলে আমি দুঃখ পাই।

আমাদের পীযূষদা

নবকুমার নন্দী

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন বেশ কিছু দিন হয়ে গেল। তার প্রয়াণ পরিণত বয়সেই হয়েছে, সে সম্পর্কে হয়ত আক্ষেপের কিছু নেই, তবুও ওর সম্পর্কে দীর্ঘদিনের টুকরো টুকরো স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল হয়ে ভাসে। পীযূষদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই ১৯৫২ সালের কোন এক সময়ে। সবে তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। নূতন নূতন ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটছে। রাজনৈতিকভাবে সমভাবনার ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন দলে বা গোষ্ঠিতে সংঘবদ্ধ হচ্ছে — কিছুদিন পরেই ছাত্র সংসদের নির্বাচন। এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে জানা গেল — অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত ছাত্র ফেডারেশনের কর্মিদের মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি ক্লাস নেবেন। মনে আছে, নির্দিষ্ট দিনে বিকালের দিকে আমরা গুটি কয়েকজন আশুতোষ বিল্ডিং এর একটা শ্রেণী কক্ষে সমবেত হয়েছি। তখন ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মিসংখ্যাও ছিল নগন্য। ৫২ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়, ফলে প্রকাশ্যভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজকর্ম শুরু হয় তখন। যা হোক সেই ক্লাসের কথায় আসি। যথাসময়ে রণজিত লাহিড়ী, রণজিত দাশগুপ্ত (প্রয়াত অধ্যাপক রণজিত দাশগুপ্ত) প্রয়াত সুনীল চ্যাটার্জি প্রমুখ সৌম্যকায় সুদীর্ঘ এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে সেদিন আমাদের মধ্যে এলেন। বুঝতে অসুবিধা হল না ইনিই পীযূষ দাশগুপ্ত। প্রাথমিক পরিচয়ের পর পীযূষদা বলতে শুরু করলেন। চিন্তা ও আবেগের মিশ্রনে তিনি প্রথম মার্কসীয় দর্শ ব্যাখ্যা করলেন এবং পরের দিন ব্যাখ্যা করলেন মার্কসীয় অর্থনীতি "Proletarious have nothing to lose but their chains. They have a world to win" -যে উদাত্ত কণ্ঠে Communist Manifesto এর শেষ কয়টি ছত্র তিনি উচ্চারণ করেছিলেন এখনও যেন সেটা কানে বাজে। ক্লাসের পর দুই একটি প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে ওর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ধীরে ধীরে আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় হয়। সুযোগ হলেই ওর সঙ্গে সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতাম এবং সন্দেহ নেই, এতে মনোবল আরও বৃদ্ধি পেত। প্রথম প্রথম মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতাম, আবার কখনও কখনও ওর পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে গিয়েছি। ওর বাড়ীর সকলের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি। ওর ভ্রাতা অধ্যাপক শংকর দাশগুপ্ত (D.G.S.) এর সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে ওঠে মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে, সে সম্পর্ক এখনও অটুট।

যে সময়ে পীযূষদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে, সে সময়টা ছিল আর্ন্তজাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের, বলা যেতে পারে, স্বর্ণময় যুগ। সবে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সোভিয়েত লালফৌজের হাতে নাৎসী বাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও পর্যদস্ত। চীনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য অর্জন করেছে। মতাদর্শগত ভাবে মার্কসবাদ - লেনিনবাদ মানব জাতি বিশেষতঃ নিপীড়িত শোষিত শ্রমিক কৃষকদের সামনে নূতন জীবনের স্বপ্ন তুলে ধরেছেন। বিশ্বের বুদ্ধিজীবিদের

ব্যাপক অংশের উপর এর প্রভাব তখন প্রতিফলিত। এর প্রভাবে এদেশের পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবিরাও সঞ্জীবিত ঐ সময়ে ছাত্র যুবদের চেতনা জগতকে যে সকল ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত করতেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাদের কয়েকজন হলেন ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ এবং এমন আরও অনেক মার্কসবাদে দীক্ষিত পন্ডিত ও মনিষী। অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত ছিলেন ওদেরই সমসাময়িক, কিন্তু তার অনন্য ব্যক্তিত্বে, মার্কসবাদ, লেনিনবাদের প্রগার পান্ডিত্যে ও সর্বোপরি একনিষ্ঠ সক্রিয় কম্যুনিষ্ট রূপে অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত ওদের মধ্যেই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। আপাদমস্তক তিনি ছিলেন এক পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই হয়ত অন্যাদের তিনি রাজনৈতিক ভাবেই সহজেই প্রভাবিত করতে পারতেন।

এম. এ. পাশ করার পর যখন চাকুরীর সন্ধান করছি তখন একদিন কথায় কথায় পীযূষদা বলেন ওর কলেজে দর্শনের একটি পদ শূন্য আছে। পীযূষদা আমাকে তার কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ডঃ অনিল বন্দোপাধ্যায়ের নিকট নিয়ে যান। অধ্যক্ষ মামুলী কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর বলেন, — মাইনের খাতায় লিখতে হবে ১২৫, হাতে পাবেন ৯০ টাকা, কিন্তু তাও একবারে পাবেন না। দুই বা দিন কিস্তিতে পাবেন। তখন অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী কলেজ গুলোর অবস্থা এরকমই ছিল। বর্তমান প্রজন্মের কলেজ শিক্ষকরা এ অবস্থাটা হয়ত ভাবতেই পারবেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ থেকে কোন নিয়োগপত্র আসেনি — এল রামপুরহাট কলেজ থেকে। এখবর শুনে পীযূষদা আমাকে রামপুরহাটেই যেতে বলেন এবং সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক মনীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেন। যখন ওর কাছ থেকে চলে আসার উপক্রম করছি তখন হাসতে হাসতে বলেছিলেন — "ভাল কম্যুনিষ্ট হতে গেলে, ভাল শিক্ষক হতে হয়", প্রসঙ্গতঃ তিনি Kalinin এর "On Education" নামক বইখানা পড়ে নিতে বলেন।

রামপুরহাট কলেজে আমার যোগদানের কিছু পূর্বে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে সহপাঠী বন্ধু প্রয়াত রবীন্দু গুপ্ত সে কলেজের বাংলা বিভাগে যোগদান করেছেন। রামপুর হাট কলেজে যোগদান করার পর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মনিদা (অধ্যাপক মনীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী) রবীন্দু সহ রামপুরহাটে আমার মেসে এক রবিবার সকাল বেলা এসে উপস্থিত হন। মনিদা প্রথমেই আমাকে পীযূষদার কথা বলেন এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তা ও বলেন। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমাকে এবং ঐ কলেজে যারা নূতন এসেছেন তাদের সকলকে WBCUTA এর সদস্য করা। নানা কারণে মনিদার সঙ্গে পরে আরও নিবিড়ভাবে মেশার সুযোগ হয়েছে। তিনি অধ্যাপক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেনই, তার সঙ্গে বীরভূমের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।

রামপুরহাটে যাওয়ার পর থেকে পীযূষদার সঙ্গে খুব কম সময়ই আমার দেখা হত। শুধুমাত্র WBCUTA এর কাজে কলকাতায় এলে সতীনদার (অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) বাড়িতে ওর সঙ্গে দেখা হত। এর পর সরকারী কলেজে নিয়োগপত্র পাওয়ার পর পীযূষদার সঙ্গে

পরামর্শ করতে সরকারী কলেজে যাব কিনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে। তখন পীযূষদা আমায়কাকাবাবুর নিকট নিয়ে যান ও ওর সম্মতিও পেয়ে যাই। কাকাবাবুর নিকট অবশ্য পীযূষদার সঙ্গে এর আগেও কয়েকবার গিয়েছি।

অপ্রাসঙ্গিক বলেও এখানে আর একটা কথা বলে নিই। সরকারী কলেজে প্রথমে আমি কুচবিহার A.B.N. Seal. (তখনকার Victoria College) কলেজে যোগদান করি। কুচবিহার হোটেলে একটি একক ঘরে থাকতাম। কুচবিহারে তখন প্রচন্ড শীত। এক রাতে তখন ১০/১১টা হবে বাইরে দরজায় টোকার শব্দ পেলাম। দরজা খুলতেই দেখি চাদর মুড়ি দিয়ে দুই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। প্রথমে তারা আমার নাম জেনে নিশ্চিন্ত হলেন এবং ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। শুধু বললেন কলকাতা থেকে খবর পেয়েই ওরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। এই দুইজনের একজন দীর্ঘকায় কিন্তু একটি হাত নেই। অপরজন ছোটখাটো চেহারার মানুষ। প্রথম জন দেবী নিয়োগী এবং দ্বিতীয়জন বীরেন দে সরকার। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী ওরা আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কুচবিহারে তখন কুচবিহার বুক এজেন্সী নামে একটি বইয়ের দোকান ছিল — অনেকটা N.B.A. - এর অনুকরণে। সেখানে রুশ ও চীনদেশের বই পাওয়া যেত। ওদের কথা মত কুচবিহার বুক এজেন্সীর অনিল রায়ের সঙ্গে পরিচয় করে নিই। সরকারী চাকুরেদের তখনকার দিনে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখা ছিল একেবারেই বে-আইনি। এজন্যই এত সতর্কতা। কুচবিহারে থাকাকালীন সময়ে পীযূষদার সঙ্গে ২/৩ বারের বেশী দেখা হয় নি।

ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ ১৯৫৮ সালে মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে বরখাস্ত তখনকার দিনে এটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। বাম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অজুহাতে বিভিন্ন সময়ে বহু কৃতী অধ্যাপকেরই চাকুরী গেছে। অধ্যাপক সমিতি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, কখন ও সখনও হয়ত সফল হয়েছে, কিন্তু পীযূষদার ক্ষেত্রে তা সফল হয় নি। পীযূষদা শেষ পর্যন্ত আরও কয়েকজন সহকর্মি সহ কলেজে অনশন আরম্ভ করেন। তাতে কর্তৃপক্ষের অনড় মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। পীযূষদা চাকুরীতে বহাল হলেন না। এসময় চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও পীযূষদার সংগ্রামী মনোভাবের কোন চির দেখা গেল না। কম্যুনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক কর্মে নিজেকে সম্পূর্নরূপে সপে দিলেন।

১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আমি কুচবিহার থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় মৌলানা আজাদ কলেজে যোগদান করি এবং পীযূষদার সঙ্গে আবার যোগাযোগের সুযোগ ঘটে। ১৯৬২ সাল, ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের এক সংকটময় সময়। চীন - ভারত সীমান্ত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কম্যুনিষ্টদের মধ্যে মতাদর্শগত বিভাজন তীব্র আকার ধারণ করে। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ আক্রমনকারী হতে পারে কিনা এ বিষয়ে সুদুর প্রসারী এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কর্মিদের মধ্যে নানা রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এ সময়ে আমরা অনেকেই পীযূষদার শরণাপন্ন হই। পীযূষদা তখন শ্যামবাজারে একটা বাড়ীতে থাকতেন। সেই বাড়ীর ছাদে ওর সঙ্গে আর্ন্তজাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন

সম্পর্কে, সোভিয়েত নেতৃত্ব, চীন কমুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, মতাদর্শগত প্রশ্নে আমাদের জিজ্ঞাসাগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করতেন। ঐসময় অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক মানিক বল, পরেশ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই যেতেন। মধ্যে মধ্যে D.G.S. ও উপস্থিত থাকতেন। পীযূষ বৌদি সকলকে চা দিতেন। আড্ডা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলত। তবে যেহেতু আমি তখন যাদবপুর অঞ্চলে থাকতাম, সেজন্য সব দিন ঐ আড্ডায় যোগ দিতে পারতাম না। কিংবা তাড়াতাড়ি চলে আসতাম। পীযূষদা যখন মির্জাপুর N.B.A. তে নিয়মিত বসতে আরম্ভ করেন, তখন কলেজের পর প্রায়ই নানা প্রশ্ন নিয়ে ঐখানে ওর কাছে চলে আসতাম। তিনি প্রশ্ন গুলোর জন্য কোন কোন দিন কিছু বইয়ের উল্লেখ করতেন। কোন বইয়ের কোন অধ্যায় পড়তে হবে তা ও বলে দিতেন। পার্টির মধ্যে যেমন ৬২ সালের দিকে যেমন শোধনবাদী ঝোঁক দেখা দেয়, তেমনি ৬৭ সালের দিকে অতি বাম ঝোঁক ও দেখা দেয়। পীযূষদা এই উভয় ঝোঁকে বিরুদ্ধেই ঐ সময় দেশহিতৈষীতে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। নিরলসভাবে তিনি ঐ দুই ঝোঁকের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন। পার্টি সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় স্তালিন এক জায়গায় পার্টি কর্মিদের 'Proletarian Disinterestedness কথাটি ব্যবহার করে ছিলেন। পীযূষদাকে যেভাবে দেখেছি বা বুঝেছি এ কথাটা আংশিকভাবে হলেও ওর সম্পর্কে প্রযোজ্য। নেতাজীনগর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপকরূপে কিংবা পার্টির একজন সাধারণ কর্মি হিসারে যেভাবেই দেখি না কেন, ওর মধ্যে সেই গুণটা অদ্ভুতভাবে উপস্থিত ছিল। শত বিঘ্ন, শত আর্থিক অনটন কোন অবস্থাতেই ওর উন্নতশীর, নত হতে দেখি নি, কোন অবস্থাতেই তাকে মার্কসবাদ - লেনিনবাদের মূল ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে দেখিনি। যখন তিনি কলকাতার Flat বিক্রি করে বাঙ্গালোরে তার কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন একদিন বিকালে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেটাই শেষ দেখা। কথা দিয়েছিলেন কলকাতায় আবার আসবেন। আসা হল না। মনে হয়েছিল তীব্র বেদনা নিয়েই কলকাতা ছাড়ছেন। ওর শেষ কথা 'আমি এখনও মার্কসবাদী - লেনিনবাদী এবং থাকবও। সমাজতন্ত্রের জয় হবেই।

পুঁজিপতির বিশ্বায়ণ এক নয়া সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। একমাত্র মার্কসবাদই মানবজাতিকে এর থেকে মুক্তি দিতে পারে। পীযূষদার অজস্র লেখা এবং সর্বোপরি ক্যাপিটালের বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ এদেশের মানুষকে অবশ্যই প্রেরণা যোগাবে — পীযূষদার সর্বশেষ উক্তি 'সমাজতন্ত্রের জয় হবেই' এর সার্থক রূপায়ন ও অবশ্যই ঘটবে।

পরমাত্মীয়

পন্ডিত শঙ্কর ঘোষ

শ্রদ্ধেয় শ্রী পীযূষ দাশগুপ্তের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এখনও চোখ বুজলে পীযূষ বাবুর চেহারা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে ওঠে ১৯৬৪ সালে পীযূষ বাবু তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে আমাদের বাগবাজারের বাড়ির ১২ / ১ / বি, পশুপতি বসু লেন -এ দোতলার Flat ভাড়া নিয়ে আসেন। এক তলায় ছিল আমার শোবার ঘর ও রেয়াজ বা class room। তখন আমি দীর্ঘ সময় ধরে তবলা রেয়াজ করতাম। Programme এর জন্য বলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে আসলে পীযূষ বাবু বলতেন। "বাড়িটায় যেন প্রাণ ছিল না এতো দিন। শঙ্করের তবলার সাধনা আমাদের মন ও প্রাণকে উজ্জীবিত করে।"

প্রতিবার কোন অনুষ্ঠান থেকে বা Tour থেকে ফিরলে অতি আত্মীয়ের মতো অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন। পীযূষ বাবু একজন অধ্যাপক ছিলেন জানতাম, আবার এও জানতাম যে তিনি একজন সক্রীয় রাজনীতিবিদ্‌ও ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে পুলিশের নজর এড়াবার জন্য বাড়ি ছেড়ে, স্ত্রী, পুত্রদের ছেড়ে অন্য কোথাও আত্মগোপন করতে দেখেছি। ওঁর স্ত্রী, বৌদিকে দেখেছি কিরকম মনের জোরে দুটি বাচ্চাকে নিয়ে সংসারের হাল ধরেছেন। হঠাৎ রাত্রি একটা বা দুটোর সময় দেখেছি পীযূষ বাবুর Phone আসতে ও সঙ্গে সঙ্গেই পীযূষ বাবুর গৃহত্যাগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ বাহিনীর আবির্ভাব ও পীযূষ বাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ। এরকম প্রায়ই ঘটত। উনি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমাদের মনে পরম আত্মীয়ের অনুপস্থিতি অনুভব করেছি। পীযূষ বাবুর মৃত্যু সংবাদে পুরোনো স্মৃতির উদয় মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। সম্প্রতি Phone -এ হঠাৎ বৌদির কন্ঠস্বর শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছি। আত্মীয়তা আবার ফিরে এসেছে।

স্যার কে যেমন দেখেছি

নীলিমা দাস

নেতাজীনগর কলেজে কর্মসূত্রে প্রিন্সিপাল পীযূষ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম প্ররিচয়। পরিচয়ের সূচনা থেকেই ওনাকে আমার আর পাঁচজনের মতো মনে হয় নি। অবশ্য আমার Interview দেওয়া থেকে চাকুরী পাওয়া পর্য্যন্ত ঘটনা পরস্পরা তেমনই ছিল, সে কথা থাক।

আমার চাকুরীর ঐ '৭০ সাল থেকে দীর্ঘদিন আমরা ১২ মাসের মাইনে ২২ মাসে পেতাম অর্থাৎ যেমন যেমন উনি যোগাড় করতে পারতেন, যখন যখন। আদপে কিন্তু প্রিন্সিপালের কাজ কলেজ পরিচালনা করা। এই ধরণের Principal কোথায় পাওয়া যায়? আমরা পেয়েছিলাম। পারিপার্শ্বিক বাতাবরণে স্যার-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন কলেজে থাকতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু যতদিন ছিলাম সেগুলি ছিল আমার কাছে স্বর্ণময় দিন। আর্থিক অনটনের মাঝে স্যার-এর ছত্রছায়ায় আমরা সকলে এক অদৃশ্য বন্ধনে আত্মার আত্মীয়ের মত ছিলাম। আমার কাছে কলেজকে মনে হতো house, away from home, আর স্যার কে মনে হতো বাড়ীর বড় দাদাটির মত অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

স্যার যখন তাঁর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ফাঁকে মাঝে-মধ্যে বিকেলের দিকে Staffroom-এ - এসে বসতেন কিছুক্ষণ, তখন ওনার স্বাভাবিক পরিহাস প্রিয়তায় এত মজা করে কথাবার্তা বলতেন — মনে হোতোনা উনি বন্ধু ছাড়া অন্য কেউ, এত হৃদ্য। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের মধ্যেও একটা অভিভাবক সুলভ দূরত্ব রেখে চলতেন, যে জন্য উনি সর্বদাই থেকেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয়। ওনাকে আমি কখনো ধমক দিয়ে, কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখিনি বা শুনিনি। প্রিন্সিপাল হিসাবে কলেজের প্রায় সকলেরই দোষ / গুণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি / ন্যায় / অন্যায়ের খবর তাঁর অজানা থাকতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু কারো কোন অবগুণ নিয়ে উনি আলোচনায় যেতেন না। নিঃশব্দে তার সম্যক ব্যবস্থা নিতেন। অপরের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ব্যতীত এটা সম্ভব হয় না। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্য সম্পর্ক। এতে তাঁর কলেজের সার্বিব কল্যাণ আকাঙ্খারই নিরিখ মিলতো।

'৮০ সালে, উনি তখন কলেজে নেই, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর উনি আমার সঙ্গে দেখা করে ১০ মিনিট বসে, তিনটে কথা বলেছিলেন — প্রথম — 'এ জগতে প্রতিটা মৃত্যুই অপরিমেয় বেদনাময়, তবুও তা কাটিয়ে উঠতে হয় এখানকারই জল-বাতাসে। দ্বিতীয় - প্রতিটি জন্মের সঙ্গে মৃত্যু যেমন নিয়ম সিদ্ধ ঘটনা, আমাদের জীবনের সঙ্গে কর্মও তেমন নিয়মবদ্ধ দায়িত্ব। তৃতীয় — কালক্ষেপ না করে তুমি আত্মস্থ হও - কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। আমার প্রতি তাঁর এই সান্ত্বনার মাঝে একজন প্রকৃত ছাত্র-দরদী প্রিন্সিপালের উপদেশ ধ্বনিত হয়েছিল।

তাঁর উপদেশটি আমি '৯৪ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মনে রেখে কলেজে কাজ করে গেছি।

বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, শেষের দিকে কলেজে ওনাকে কাজ করতে হয়েছে। তখন ওনার সহনশীলতা, ধৈর্য্য ও মনোবল দেখে অবাক হয়েছি। যত কিছুই হোক না কেন স্থির লক্ষ্যে উনি নিরুদ্বিগ্ন, নির্ভীক মনে সটান শরীরে, সহাস্যমুখে, ঋজুচলনে আশে পাশের কারো কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে গন্তব্যে এগিয়ে গেছেন। ভাবনা-চিন্তা কি ওনার ছিল না ? বহুজনের থেকে অনেক অনেক বেশীই ছিল, সবই তিনি সারতেন তাঁর পরম স্থিতধীতায় সমাহিত চিত্তে। স্যার ছিলেন অসম্ভব মননশীল এবং প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অনেক উচ্চমার্গে সমাসীন তাই জাগতিক দুঃখ কষ্টে তিনি অবিচল এবং অমলিন থেকেছেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। নিজের বিশ্বাসে তিনি অটল থেকে নিজের কাজ তিনি অনলস ভাবে করেছেন এক থেকে অন্যভাবে, ভিন্ন পথে — উনি কখনো থামেন নি, হারেন নি।

গত ২৫ শে মে সকালে স্যার আমার সঙ্গে Phone কথা বলেছিলেন — আমি দেখা করবো বলেও শারিরীক অসুস্থতায় দেখা করতে পারিনি। উনি আমাকে আর সময় দিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই জীবনযুদ্ধের বীর সৈনিক বীরগতি প্রাপ্ত হলেন।

আমার অগ্রজ-প্রতিম স্যার আমার চোখে স্থিত প্রজ্ঞই নয়।

কাল - উত্তীর্ণ পুরুষ।

পীযূষদাকে মনে রেখে

নাসিমা দে

পীযূষদা আর আমাদের মধ্যে নেই। যে মানুষটির অন্তর এবং বাইরের চেহারাটা ছিল সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে ছিল কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতিফলন। যে ভাবধারা তাঁকে করেছিল তেজোদীপ্ত, বলিষ্ঠ। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহজ সরল জীবন যাপন সাধারণ মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করতো।

আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখন আমি কলেজের ছাত্রী। ছাত্রফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলাম তখন - অতি সাধারণ। কিন্তু পীযূষদা তখন পার্টির একজন নামী তাত্ত্বিক নেতা। তিনি এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন যে তিনি যেন আমার অতি কাছের লোক। নেতা এবং সাধারণ কর্মীর মধ্যে ব্যবধান যেন তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের নির্দেশে কোথায় মিলিয়ে গেছে। বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি অনেকদিন মার্কসবাদের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ক্লাস নিয়েছেন। খুব সহজ কথায় আমাদের বোধগম্য করে তিনি জটিল বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করতেন। আমরা অর্থাৎ ছাত্রফ্রন্টের কর্মীরা খুবই অনুপ্রাণিত হতাম তাঁর বক্তব্য শুনে। পার্টি মহলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে জনপ্রিয়। কমিউনিস্ট আদর্শ এবং মূল্যবোধের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। এ বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক পার্টি কমরেডরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এক মত হবেন।

পীযূষদা থাকতেন আমাদের পাশের বাড়ীতে। ১৯৪৯। সাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন ছিল বে-আইনি। পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়নি। পার্টির মুখপত্র "স্বাধীনতা" তখন খুব ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হোত। এ পত্রিকাও ছিল স্বাভাবিক কারণেই বে-আইনি। আমরা পার্টি কর্মীরা খুব গোপনে এই পত্রিকা বিক্রি করতাম। পার্টি কর্মীদের উপর নেমে এসেছিল নির্মম পুলিশী নির্যাতন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেসী সরকার। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রীর আসনে। এই বছরই ২৭শে এপ্রিল (১৯৪৯) বৌবাজারের মোড়ে বন্দী মুক্তি এবং বন্দীদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দানের দাবীতে মিছিল করতে গিয়ে কংগ্রেসী সরকারের পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন চারজন মহিলা আন্দোলনের নেত্রী - প্রতিভা, লতিকা, অমিয়া এবং গীতা। সঙ্গে একজন ছাত্র নেতা — বিমান তার নাম। এই পটভূমিকায় একদিন ছোট স্বাধীনতা পত্রিকায় দেখলাম হাজরায় একটি পথ সভা করতে গিয়ে পীযূষ দাশগুপ্ত পুলিশের নির্মম প্রহারের শিকার হয়েছেন। আঘাত ছিল খুবই গুরুতর। এই বছরেই একদিন রাত্রের শেষ প্রহরে শ্লোগানের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দোতলার বারান্দায় (১৭এ, দিলখুশা স্ট্রিট) দাঁড়িয়ে দেখলাম রাতের অন্ধকারে একটি কালো পুলিশ ভ্যান — শ্লোগানের শব্দে মুখরিত। পার্টির অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে পীযুষদাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে পাশের বাড়ী থেকে। ক্ষোভে দুঃখে মনটা ভরে গেল। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলাম — যে পার্টির কর্মীরা আদর্শের জন্য এত নির্যাতন সহ্য করেন — এত আত্মত্যাগ করেন সেই পার্টিতেই থাকব। এখনো আছি। পীযূষদা হয়ে থাকবেন আমার প্রেরণার উৎস।

পীযূষদাকে যেমন দেখেছি

কে.ডি. ঘোষ

পরিপূর্ণ বয়সে পীযূষদা (কমঃ পীযূষ দাশগুপ্ত) প্রয়াত হয়েছেন। একজন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে আমরা বেদনা অনুভব করি এবং সেই চরম বেদনার একটা সীমাবদ্ধতাও থাকে। কিন্তু শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে, সমাজ বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে, জীবনের অধিকাংশ সময় যিনি নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে যান তিনি শুধু একজন নিছক ব্যক্তি হন, তিনি নিজেই একটি দর্শন। এবং তাঁর সেই দর্শন মামুলি ভাববাদের দর্শন নয়, সে দর্শন বস্তুবাদের উপর নির্ভরশীল সমাজ পরিবর্তনের দর্শন। পীযূষদা ছিলেন সেই দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক বড় মাপের মানুষ। সম্ভবত চল্লিশ দশকের প্রায় শেষে আমি পীযূষদার নাম শুনি। তখন আমি নবদ্বীপে থাকি ও ওখানকার একটি স্কুলে পড়ি। পীযূষদা তখন নবদ্বীপে সদ্য গড়ে ওঠা বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করছেন। সেসময় কোন একটি রাজনৈতিক দলের (যদিও কংগ্রেস নয়) হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। পরবর্তীকালে কলকাতার কলেজে অধ্যাপনাকালেও তাঁকে একই কারণে হেনস্তা হতে হয়। তথাপি তিনি ছিলেন কমিউনিষ্ট মতাদর্শে অবিচল।

ব্যক্তিগতভাবে আমি পীযূষদাকে জানি ১৯৬৫ সালে। সে সময় কাকাবাবু (কমরেড মুজফ্ফর আহমদ) প্রতিবছরই কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিনে তাঁরই বাড়ি যেতেন। কাকাবাবুর স্নেহধন্য পীযূষদা, কবি শ্যামসুন্দর দে তাঁর সঙ্গে যেতেন। আমি বার দুয়েক তাঁদের সাথে গেছি। তখন পার্টির একটিই মোটরগাড়ি ছিল। আমরা সেই 'ফিয়াট' গাড়ি করেই যেতাম। সে সময় পীযূষদার সাথে আলাপ। কখনো সখনো কথা হয়েছে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির অফিসে। তখন তাঁর কথাবার্তা, চলাফেরায় একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। কর্তৃত্বের মনোভাব, অহংকার যা প্রতিনিয়ত আজ প্রতিফলিত, তাঁর ছোঁয়া পীযূষদার চরিত্রে লাগেনি। তাঁর বিনয়ভাব আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁর কমরেড সুলভ ভালবাসা মনে রাখার মতোন। একবার আমি প্রকাশনার কাজে নামি। সেই প্রকাশনার নামকরণ করেন পীযূষদা। প্রকাশদার নাম হয় 'উদয়ন'। খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশ করি কবি বন্ধু শ্যামসুন্দর দে-র 'মুখর মুহূর্ত।' স্বাভাবিকভাবে আমার সেই প্রকাশনার নামের সাথে পীযূষদার স্মৃতি আজও বিজড়িত।

কমিউনিস্ট মতাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন হঠকারী 'নকশাল আন্দোলন' পশ্চিমবাংলার মাটিতে দেখা দেয় তখন এর বিরুদ্ধে, সি. পি. আই (এম) -এর নেতৃত্বে পীযূষদার সংগ্রাম নজর কাড়ার মতো। আমরা যারা ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে জড়িত তাঁদের উদ্যোগে একবার শেক্সপিয়ার সরণির কোন এক জায়গায় পীযূষদাকে আনা হয়। 'নকশাল' হঠকারীদের বিরুদ্ধে তিনি সে সময় বক্তব্য রাখেন. অত্যন্ত সুন্দর, সহজ ভাষায় ও বলিষ্ঠভাবে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তা আমাদের মনে আজও গেঁথে আছে। যদিও এটা ঠিক, 'নকশাল' আন্দোলন তখন মধ্যবিত্ত মানুষের একটি অংশে যতই আলোড়ন সৃষ্টি করুক আমাদের ট্রেডইউনিয়নের চৌহদ্দিতে তার ছোঁয়া লাগেনি।

বাগবাজার অঞ্চলে দীর্ঘকাল অবস্থানের জন্যই হয়ত পীযূষদার সঙ্গে ওখানকার বহু কমরেডদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল. তাঁদের মুখেই শুনেছি — ওখানকার ব্যাপক পার্টি সদস্য, নকশাল হওয়ায়' সি.পি.আই-এম ত্যাগ করতে উদ্যত। দুজন শীর্ষ স্থানীয় পার্টি নেতা পর্যায়ক্রমে ঐ এলাকায় এসে বক্তৃতা দেন। বাস্তব পরিস্থিতি তাঁরা কমরেডদের বোঝান এবং পার্টি ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকার কথাও বলেন। কিন্তু তাতে কারো মনে তেমন দাগ কাটেনি। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে চলে যাবার আগেই পীযূষদা তাঁদের বোঝাবার দায়িত্ব পান। কোন একটি জায়গায় পীযূষদা প্রায় দু-ঘন্টা ধরে হঠকারী 'নকশাল আন্দোলনের' বিরুদ্ধে যে-বক্তব্য রাখেন তাতে নকশাল - দরজায় পা বাড়ানো ৯০ শতাংশ পার্টি সদস্যই সি. পি. আই (এম) -এ থেকে যান। পার্টি শিক্ষক হিসাবে এইভাবেই পীযূষদা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত।

সত্তর দশকের কালো দিন গুলিতে কংগ্রেস নকশাল আক্রমণে পার্টি সদস্যরা যখন লাঞ্ছিত এবং হতাশায় আক্রান্ত ঠিক সে সময়ও পীযূষদাকে প্রয়োজন হয়। আলোর দিশারী হিসেবে পীযূষদা কোন একটি স্কুল বাড়ির দোতলায় হলভর্তি কমরেডদের কাছে তাঁর বক্তব্য রাখেন। সূর্য তখন অস্তগামী, পশ্চিমের আকাশ তখন, লালের আভায় পরিব্যপ্ত। এই পরিবেশেই পীযূষদা তাঁর দীর্ঘ ভাষণ রাখেন। সমস্ত কমরেডরাই উৎসাহে আন্দোলিত। রক্তহীন দেহে যেন রক্তের চাঞ্চল্য। পীযূষদা বার বার আদর্শ স্থানীয় শিক্ষক হিসেবে এইভাবে কমরেডদের মনে স্থান করে নিয়েছেন। মনে রাখা দরকার, মার্কসবাদী পন্ডিত হলেই সুবক্তা হওয়া যায় না। তত্ত্বকে আয়ত্ব করে আকর্ষনীয়ভাবে বক্তব্য পেশ করার মধ্য দিয়েই সুবক্তা হওয়া যায়। সে গুন ছিল পীযূষদার। অমন শিক্ষক নিঃসন্দেহে বিরল।

শ্রীরামপুর পার্টির উদ্যোগে মে-দিবস পালনের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে পীযূষদা আমন্ত্রিত। সেখানে তাঁর বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ। বক্তৃতা শেষ হবার পর অন্তত পঞ্চাশ জন শ্রোতা পীযূষদার সঙ্গে পরিচিত হতে তীব্র আগ্রহী। সার্থক এই পার্টি শিক্ষক সম্পর্কে তাঁরই সঙ্গে শ্রীরামপুরে যাওয়া বাগবাজার অঞ্চলের সি.পি.আই(এম) - এর কমরেড অজয় ঘোষের কাছে এই ঘটনা শোনা।

পীযূষদা যে শুধু ভাল বক্তা তাই নয়, কোন বক্তার ইংরেজী ভাষনের তাৎক্ষনিক বাংলা অনুবাদ করার দক্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন। কমরেড এম. বাসব পুন্নাইয়া -সহ পার্টির বহু বক্তার বক্তৃতা সুন্দরভাবে অনুবাদ করতেন।

পীযূষদা মার্কসবাদী এক তাত্ত্বিক নেতাই ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন পার্টির এক দক্ষ সংগঠক। সে বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ পরে করা যায়।

১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পীযূষদা কাশীপুর কেন্দ্র থেকে সি.পি. আই(এম) এর প্রার্থী হন। ঐ নির্বাচনে তিনি ভোটে পরাজিত হন।

১৯৬৯ সালে পার্টি থেকে ঐ একই কেন্দ্রে প্রার্থী হন, বিশিষ্ট ট্রেডইউনিয়ন নেতা কে.জি. বসু। কিন্তু বাগবাজার অঞ্চলের ব্যাপক মানুষের আশা আকাঙ্খা ছিল, পীযূষদাকে ফের মনোনয়ন দেওয়া হোক। বাগবাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কাকাবাবুকে ('কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ') তাঁদের মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেন। কাকাবাবু বলেন, 'এ বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। তবে তিনি তাঁদের মনোভাবের কথা পার্টিকে জানাবেন।'

ঐসময় পীযূষদা কাশীপুর বিধানসভা নির্বাচনে পার্টির দায়িত্বে রইলেন।

কোন একদিন পীযূষদা ঐ এলাকায় থাকা একটি পুলিশ আবাসনে নির্বাচনের কাজে যান এবং ওখানকার অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি) -এর সঙ্গে দেখা করতে চান। ওসি পীযূষদার শ্লিপ পেয়ে দ্রুত বাইরে এসে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পীযুষদাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান এবং প্রথমেই জলযোগের আপ্যায়নের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। পীযূষদা আপত্তি জানালে ওসি-র যুক্তি হলো, তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা দুজনেই মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজে পীযূষদার ছাত্রী ছিলেন এবং অধ্যাপক হিসেবে তিনি তাঁদের কাছে অত্যান্ত শ্রদ্ধার। কিছু না খেলে ওসি তাঁদের কাছে অবশ্যই তিরস্কৃত হবেন। অগত্যা পীযূষদা শুধু চা খেলেন। আসল কথা হল, পীযূষদা পুলিশ আবাসনে কত ভোটার আছে জানতে চান। ওসি-র জবাব, পুলিশ ভোটারদের কেউ স্থিতিশীল নয়। দুদিন বাদে ওসি তাঁর কথামতো যে রিপোর্ট দিলেন তাতে জানা গেল, প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটার ওখানে নেই। সাংগঠনিক শক্তির পাশাপাশি-সঠিক এই 'স্ক্রুটিনি' করার ফলেই কে. জি. বসুর জেতার পথ সুগম হয়। তিনি জেতেন ১৯৫ ভোটে। এক কথায়, পার্টির নির্দেশে ও পীযূষদার নেতৃত্বে সাংগঠনিক কর্মকান্ড ও বুদ্ধিমত্তার জন্য কাশীপুর কেন্দ্র থেকে অল্প ব্যবধানে হলেও, সি. পি. আই (এম) প্রার্থী জিতে যান।

পীযূষদা সংসদীয় গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখায় বিশ্বাসী নন। তিনি সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন। যেবার পীযূষদা কাশীপুরে নির্বাচনে পরাজিত হন, সে সময় অনেক কমরেড মুষড়ে পড়েন। পীযূষদা মুষড়ে-পড়া কমরেডদের কাছে এত সুন্দর ভাবে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করেন যার ফলে সেইসব কমরেডরা মুহূর্তে উঠে দাঁড়ান ও পার্টির কাজে তক্ষুনি ব্যাপৃত হন। মনে পড়ে, ১৯৬৩ সালের ৫ই আগষ্ট মুজফ্‌ফর আহমদের জন্মদিন পালন করা হয়। জেলের ভিতরে ও বাইরে। জেলের বাইরে জন্মদিন পালনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পীযূষ দাশগুপ্ত।

গত ৩রা অক্টোবর রোটারি সদনে পীযূষদার স্মরণসভা হয়ে গেল। সেই স্মরণসভায় সি.পি.আই (এম) নেতা অনিল বিশ্বাস ও বিমান বসু পীযুষদার স্মৃতি চারণ করেন। বিশ্বাস পীযূষদার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেনষ "পার্টির আদর্শগত অভিযান ও পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এতটাই একাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন যে, অত্যন্ত পরিশ্রমের জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।"

বিমান বসু বলেন, পীযুষদা "প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলায় মার্কসের ক্যাপিটাল পূর্ণাঙ্গ

বিমান বসু বলেন, পীযূষদা "প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলায় মার্কসের ক্যাপিটাল পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করার সাহস দেখান এবং সেকাজও সম্পন্ন করেন। প্রথম জীবনে কৃতি অধ্যাপক, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনে পার্টি শিক্ষক এবং পরে সুলেখক হিসেবে পীযূষ দাশগুপ্তের জীবনকে ভাগ করা যায়। সমাজের স্বার্থে পীযুষ দাশুগুপ্তের মতো, ব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে।" এই বক্তব্য যথার্থ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের এক বন্ধু বিশিষ্ট মার্কসবাদী এক প্রধান বুদ্ধিজীবীর কাছে পীযূষদার প্রসঙ্গে মন্তব্য জানতে চাইলে, তিনি বলেন, "আমি কাল মার্কসের ক্যাপিচাল অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হল, একাজ দুঃসাধ্য এবং সেই দুঃসাধ্য কাজটাই পীযুষবাবু করেছিলেন।"

পরিশেষে বলবো, পীযূষদা পার্টির কক্ষচ্যুত হয়ে শেষ বয়সে বাঙ্গালোরে জীবন কাটান এবং সেখানেই তিনি শিষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ১১ই আগস্ট - এটাই আমাদের কাছে বেদনার, তবু কবি গ্রিমাউ-এর ভাষায় বলবো, "আমি কমিউনিস্ট, আমি কমিউনিস্টের মতো মরতে চাই"— পীযূষদার মৃত্যু - হ্যাঁ, একজন কমিউনিস্টরই মৃত্যু।

লেখক পরিচিতি

পুরো নাম কৃষ্ণদাস ঘোষ। অসিত ঘোষ - ছদ্মনামে স্বাধীনতা পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি কবি শ্যামসুন্দর দে-র কাব্য গ্রন্থ, ' মুখর মুহূর্ত, আঁধারে উজান বেয়ে, প্রকাশ করেন।

সওদাগরী অফিস কর্মচারীদের সংগঠন, ফেডারেশন অব মাকেন্টাইল এম্পলোইজ ইউনিয়নস - এর নেতৃত্বে আছেন ৩২ বছরের উপর, ১৯৭৪ সালে রেল ধর্মঘটের সমর্থন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন।

গণশক্তি পত্রিকায় ছ বছরের উপর আংশিক সময়ের কথা হিসেবে সাংবাদিকতা বিভাগে কাজ করেছেন। ঐ প্রতিকায় মূলত শিল্প কারখানার পাতায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তিনি কে. ডি. ঘোষ নামেই পরিচিত।

আমার মাষ্টার মশাই

অঞ্জলী রায়চৌধুরী

মাষ্টার মশায় এর "শ্রদ্ধাঞ্জলি" উপলক্ষ্যে যখন হলে গিয়ে পৌঁছলাম — মাষ্টারমহাশয় - এর ছবিতে রজনীগন্ধার মালা পরানো দেখে চোখের জল সামলাতে পারলাম না, মনে হলো আমার জীবনের একটি জায়গায় সম্বলহীন হয়ে গেছি। মাষ্টার মশাই হয়তো তাঁর বেদনাভরা জীবন থেকে মুক্তির আনন্দে তাঁর গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন, কিন্তু আমাদের মত ছাত্র-ছাত্রীরা যারা ওঁর সংস্পর্শে এসে নানা ভাবে উপকৃত হয়েছে তারা এখনও ওঁর জন্য এবং তাঁর উপদেশ নির্দেশ এর অভাবটা ভেবে কুড়ে কুড়ে মরছে।

শুরু হলো শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার পালা, একের পর এক গুণীমানী ব্যক্তিরা যখন শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে এগিয়ে গেলেন, আমারও একবার ইচ্ছে হয়েছিল আমি কিছু বলি, কিন্তু শ্রদ্ধেয় কমঃ বিমান বসু এবং শ্রদ্ধেয় অনিল বিশ্বাস -এর শ্রদ্ধাঞ্জলি ভাষণ শুনে মনে হলো মাষ্টার মশাই সেটা তাঁর জীবিত অবস্থাতে যদি জানতেন তবে হয়তো তিনি আরও কিছুটা সময় আমাদের মধ্যে শান্তিতে বাঁচতেন অন্তত শান্তিতে যেতে পারতেন। এঁদের এই ভাষণে আমি নিজের চোখের জল সামলাতে পারলাম না, যার ফলে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্টেজে না গিয়ে অন্তরের মধ্যে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানালাম।

আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বি. ই. কলেজের Library-in-Charge এর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। মাষ্টারমশাই-এর সঙ্গে আমার অবশ্য পরিচয় বহুদিনের। আমি মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজের Morning Section এর ছাত্রী ছিলাম। যখন কলেজ কর্তৃপক্ষ অধ্যাপিকা হাসি চক্রবর্তীর প্রতি অবিচার করে প্রস্তাব নিয়েছিল। প্রতিবাদে তিনি তাঁর পদ থেকে Resignation দেন। মাষ্টার মশাই ছিলেন গবর্নিং বডির মেম্বার। তিনি প্রতিবাদে অনশন করেন। জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কলেজের পড়াশুনা বন্ধ হবার মুখে যখন তখন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ নির্মল সিদ্ধান্তের হস্তক্ষেপে সমস্যার মিটমাট হয়। অধ্যাপিকা তাঁর সন্মানের পদ লাভ করেন। মাষ্টারমশাইকে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের রোষে পড়তে হয়েছিল। বিনা দোষে তিনি কর্মচ্যুত হলেন। প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা ঐ কলেজের তিনটি Shift - এর ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষ্যকে ঘেরাও করি। বহুদিন চলেছিল ছাত্র আন্দোলন ধর্মঘট অনশন। মাস্টারমশাই সর্বদা ছাত্রদের শান্ত থাকার কথা বলেছেন। তিনি ছাত্রদরদী শিক্ষক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পড়াবার ও বোঝাবার ক্ষমতা এত সুন্দর ছিল, যার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর কাছে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। আমরা দেখেছি বহু বাইরের কলেজের ছাত্রীরা তার ক্লাসে পড়তে আসত। আমরা অনায়াসে মাষ্টারমশাই-এর কাছে 'প্রব্লেম' নিয়ে যেতে পারতাম।

পরবর্ত্তীকালে মাষ্টারমশাই -এর অনুপ্রেরণায় বামপন্থী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করেই কর্মজীবনের শেষ পর্যন্ত আদর্শগত ভাবে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এমন কি এখনও সবার সাথে আমার যোগাযোগ আছে। কারণ আমি Bengal Library

Association, IASLIC এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির Life Member বিভিন্ন সময়ে কাজে কর্মে নীতিগত নানা সমস্যায় তাঁর পরামর্শ তাঁর সাহায্য আমি পেয়েছি। কত ভাবে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে সাহায্যের হাত খানি বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার মত বহু ছাত্র-ছাত্রী তা আজ স্মরণ করবে। আমি যখন ইকনমিক্স-এ অনার্স নিয়ে পড়ছিলাম তখন অর্থাভাবে পড়ি — মাষ্টারমশাই তা জানতে পেরে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এভাবে তিনি বহু ছাত্রের পাশে বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অসময়ে সময়ে অসময়ে স্যারের বাড়িতে যেতাম। তখনই তাঁর স্ত্রী 'শুভদির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। মাষ্টারমশাই তাঁর কর্মজীবনে শত ঝড় ঝাপ্‌টা সহ্য করেও তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে একচুল সরে দাঁড়াননি — বিস্মিত হতাম। তাঁর স্ত্রী সেই সময়ে দুটি বাচ্চা ছেলেকে কিভাবে ধৈর্য সহকারে মানুষ করেছেন সেটা নিজের চোখে দেখেছি, চমকিতও হয়েছি। আমাদের মেয়েরা মায়েরা কত সহনশীলা, কর্তব্য নিষ্ঠ! আমার মনে হত এই জন্য মাষ্টারমশাই পার্টির কাজে সম্পূর্ন আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস ! এই রকম নির্ভীক কর্মবীরকেও পার্টি থেকে বহিস্কার করা হল। মর্মান্তিক সংবাদ পেয়ে ছুটে গেলাম তাঁর কাছে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে কাগজে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'পত্রিকা আমার Statement নিতে চায়, আমি বলেছি আমি যাকে একবার ভালবেসেছি এবং শ্রদ্ধা করেছি তার সমালোচনা করতে আমি পারবনা। এটা আমার নীতিবিরুদ্ধ এবং তোমরাও সেটা নিজ নিজ কর্ম ধারায় পালন করে চলবে," আজ ছুটে গিয়ে তাঁকে পাবনা আর, তাঁর নির্দেশ আজও আমি মনে প্রাণে মেনে চলেছি।

Piyus Dasgupta, as I saw him

Dilip Mustafi
Ex. Principal,
Dumdum Motylal College, Kolkata

I saw Professor Piyus Dasgupta for the first time late in 1950's at a small gathering in Central Calcutta. He was to talk on communism in the world context. Some of us who were then working as teachers in different colleges, went in a batch to listen to him. We had already heard so much of him, as one of Calcutta's brilliant expositors of Marxism that we did not want to miss the opportunity and it was a rewarding experience. Never as yet till then, had we heard such a clear lucid exposition of class struggle, its origin and growth, its inevitability its indestructible moral core. His fervour touched us, the quict strength of his argument left us convinced. But what most impressed us was the man. His unique command of the subject he chose to speak on, his integrity did not distance him from us who belonged to the common run. He endeared himself to us, without the least conscious effort on his part.

Sometime later I had occassion to listen to him at another small gathering. That was when he contested as a candidate of the CPI(M) for the position of an M.P., his opponent being a person no less than Professor Hiren Mukherjee.

There was the same persuasive eloquence, only a new element marked his speech, the restrained poetry of passion. I can recollect to this day how he summed up. ফুল ফোটার পালা শেষ, ফল ফলার পর্ব্ব শুরু হল বলে (the flowering season is at an end; the hour is come for the fruits to mature)

My one regret is that I could not follow-up my first acquaintance with Piyus Dasgupta. He was too busy. I on my side was too diffident. I never got to know him at close quarters. That would have, I am sure, revealed to me some more sterlings facets of one of the most cherished personalities of my youthful years.

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?

সুবীর পোদ্দার

জীবন এখন শুকিয়ে গেছে তবু কোন করুণাধারা নেই।

সাম্যবাদের উৎস — সোভিয়েত রাশিয়া অনেক দিন অন্তর্হিত। চৈনিক সাম্যবাদও ম্লান। বাজারী অর্থনীতির দাপটে সমাজতন্ত্রের অবস্থা করুণ। পশ্চিম বাংলার অবস্থা আরো করুণ।

অথচআজ থেকে মাত্র তিন / চার দশক আগে পৃথিবীর আলো বাতাস জল মানুষ অন্য রকম ছিল। বুশের জায়গায় ছিল জনসন অথবা নিকসন, ছিল ভিয়েতনাম আর ছিল অসংখ্য বুদ্ধিদীপ্ত সাম্যবাদী মানুষ। এদের অনেকেই বুঝতেন, আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন। ইওরোপ ও আমেরিকার বহু লেখক স্পষ্ট ভাষায় এ নিয়ে আলোচনা করতেন — পরিত্রাণের পথ দেখাতেন। পশ্চিম বাংলার বামপন্থী নেতাদের কয়েকজন ছাড়া এ সমস্যার গভীরে যাবার ক্ষমতা অন্যদের ছিল না। পীযূষদার ছিল।

কলেজে পড়তে পড়তেই তিনি বামপন্থী রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৩৭ সাল থেকেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য। অধ্যাপনা জীবনের শুরু ১৯৪৪ সালে। ধীরে ধীরে তিনি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির এবং পরে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় শোধনবাদের বিকাশকে ভারতের সাম্যবাদীরা মেনে নিতে পারেন নি। শোধনবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ এক উত্তাল রূপ নেয়। এ নিয়ে চলচ্চিত্র নাটক কবিতা উপন্যাস বিতর্ক এবং আলোচনার ধারার কোন বিরাম ছিল না। শোধনবাদের বিরুদ্ধে পীযূষদার ভূমিকা ছিল নদীর স্রোতের মত । *সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে* নামক বিশালাকার বইটা ওঁর তত্ত্বাবধানে ত্রন বি এ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছয় এর দশকের সূচনায় সি পি আই থেকে সি পি আই এম-এর বিকাশ হয়। এই দশকের শেষে সি পি আই এম - এর যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। সি পি আই ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের জাতীয় বুর্জোয়াদের সমর্থন করায় জনসংযোগ হারায়। মতাদর্শগত বিতর্কের ধারা সত্তরের দশককে প্রবলভাবে পুষ্ট করেছিল। বিপ্লব না করলে সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন হবে না — এ বিশ্বাস তখন বাতাসে কান পাতলে শোনা যেত। এই সংগ্রামী চেতনা পীযূষদাকে পরিপূর্ণ করেছিল এবং পীযূষদাও শত গুণে আমাদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন। হাজার হাজার তরুণ ও কলেজের ছাত্র গ্রামের ও শহরের রাস্তায় নেমে এসেছিল। লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট :

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

১৯৭১ সাল থেকে নেতাজীনগর কলেজে পীযূষদার সঙ্গে আমার নিয়মিত দেখা হত। তখন ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের দৌরাত্ম্য বহুমুখী। প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফেরা দায়। এই বিপদের মধ্যেও পড়াশোনা এবং লেখাপত্রের ঘাটতি ছিল না। কলেজের বাড়িও চার তলা হল। পীযূষদা করলেন। স্ত্রীর অলঙ্কার বন্ধক দিয়ে একবার সকলের মাইনে দিয়েছিলেন। পীযূষদা ছাড়া নেতাজীনগর কলেজের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। তবু তাঁকে কলেজ থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

একটা কমিউনিষ্ট পার্টিকে পরিণত হতে হলে তার সদস্যদের শিক্ষার মান অবশ্যই উন্নত হতে হবে। কিন্তু কীভাবে তা করা যায় ? পীযূষদা জানতেন, তাঁর নিজের পার্টির মধ্যে মার্কসবাদী শিক্ষার মান তেমন উন্নত নয়। এজন্য খুব কষ্ট পেতেন। অনেক ভাবতেন। একটা ঘটনার কথা বলছি। কলেজের অর্থাভাব চলছে। আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তার পর বললেন , তুমি লুকাচের ***History and Class Consciousness*** এবং ***Writer and Critic*** বই দুটো এন বি এ থেকে কিনে ফেল। লাইব্রেরির জন্য। টাকা নিয়ে যাও। এছাড়া মায়াকোভস্কি সংক্রান্ত বইপত্রের একটা তালিকা কর। আর আমার জন্য ***Tricontinental*** এর কপি পেলে আনবে। পরের দিন ঐ বই দুটো ছাড়াও কিছু বই কিনে নিয়ে গেলাম। লুকাচের বই দুটো আদ্যপান্ত পড়ে সপ্তাহখানেক পরে যেভাবে উনি বিশ্লেষণ করেছিলেন তা এখনো আমার কানে বাজে। পীযূষদা বলতেন : শুধু গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পড়লে হবে না। বিদেশী উপন্যাস নাটক গল্প কবিতা না পড়লে বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলন এবং সমাজের প্রবাহকে সঠিকভাবে বোঝা যায় না। এ ধরনের মন্তব্য পীযূষদা ছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে কেবলমাত্র অধ্যাপক হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আমি শুনেছি।

সত্তরের দশকে কলকাতার অধিকাংশ দেয়ালে বিপ্লবের পোস্টার লেখা হত। বিপ্লবের প্রশ্নে প্লেখানভ, লেনিন ও সমকালীন রাশিয়া সম্পর্কে পীযূষদার লেখা একটা তাত্ত্বিক প্রবন্ধ নিয়ে ওঁর পার্টির সঙ্গে তীব্র মতভেদ দানা বাধে। ঐ সময় তিনি স্তালিনের রচনাবলীর বাংলা অনুবাদের সম্পাদনা করতেন। পীযূষদার করা মার্কসের ***Capital***-এর বাংলায় অনূদিত বইটা

কিছুদিন পর প্রকাশিত হয়। আমাকে মজা করে বলেছিলেন : ঐ ফরাসী প্রবাদটা জান তো : , মেয়েরা সুন্দরী হলে বিশ্বাসী হয় না আর বিশ্বাসী হলে সুন্দরী হয় না। তেমনি অনুবাদ সুখপাঠ্য হলে মূলানুগ হয় না আর মূলানুগ হলে সুন্দর ও সুখপাঠ্য হয় না। আমি দুকূল রাখার চেষ্টা করেছি।

বই এর জগৎ যেমন, প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগৎ তেমন নয়। কিন্তু বই এর জগৎ যদি সাম্যবাদের পরিমন্ডলকে ঘিরে ধরে তবে তার মধ্যে রাজনীতির সুর ও ছন্দ শোনা যায় যেমন শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। ষাটের দশকের সূচনা থেকে সাম্যবাদের উত্তাল প্রবাহ নিয়ে সারা পৃথিবীতে যে সব বইপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তার ধারা আটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অটুট ছিল। চিন্তার সংঘর্ষ থেকে মুখোমুখি বন্দুকের লড়াই অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল। যেমন অপরিহার্য ছিল সারা পৃথিবীতে কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরিণ সংগ্রাম। এই ট্রাডিশন এখনো বয়ে চলেছে। এসব বিষয় নিয়ে লেখা বইপত্র পড়লে মনে হয় — পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত সাম্যবাদীরা নিজের নিজের কাজের গন্ডির মধ্যে সঠিক কাজ করে চলেছেন। নিরন্তর বিশুদ্ধতার সংগ্রাম ও সংঘর্ষে সবাই যেন অগ্নিশুদ্ধ হতে চায়। পীযুষদার পার্টি থেকে বহিষ্কারও এক ধরণের বিশুদ্ধিকরণের সংগ্রাম।

এক দিন বিকেলের দিকে বিবাদী বাগের মিনি বাস স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি, দীর্ঘদেহী ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন মানুষ দ্রুত আমার দিকে হেঁটে আসছেন। মুখে সেই পরিচিত হাসি। দু চারটে কথার পর আমি পীযুষদাকে প্রশ্ন করেছিলাম : বিশ্বের সাম্যবাদীদের এত আত্মত্যাগ, এত কষ্ট, এত বিশুদ্ধিকরণের যজ্ঞের ফল কী হল ? স্তালিনের পার্টির বিশুদ্ধিকরণ, মাও এর পার্টির বিশুদ্ধকরণ, এমনকি আপনার পার্টির বিশুদ্ধকরণ অথবা পার্টির অভ্যন্তরে নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রাম — যে নামই দিই না কেন — কোথায় চলেছি আমরা ? কিছুই ত মিলছে না।

পীযুষদা হাসলেন। বড় ম্লান হাসি। বললেন যোগাযোগ রাখতে। শত সমস্যার চাপে আমি সময় পাই নি। আজ পীযুষদা নেই। পীযুষদার "লেনিন সেন্টার" এবং "লেনিন সরণি" এখন স্তব্ধ। মানবতা, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ আর মূল্যবোধ বিশুদ্ধিকরণের যজ্ঞের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে হারিয়ে গেছে।

এই পৃথিবী গ্রহে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রথম মহাপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। শত শত চরিত্র সম্বলিত মহাভারতের ট্র্যাজিডির মত সাম্যবাদীদের জীবনযুদ্ধের মহাকাব্য লেখার জন্য একজন আধুনিক ব্যাসদেবকে আমরা খুঁজছি।

যারা অন্ধ তারাই সব চেয়ে বেশি দেখে আজকাল।

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তর স্মরণে—

চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
প্রাক্তন ছাত্র — মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ

যতদূর মনে পড়ে দিনটা ছিল ২রা এপ্রিল, ১৯৫৯ সাল। উত্তর কলকাতায় খ্যাতনামা কলেজ মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের তিনটি বিভাগ প্রাত, দিবা এবং সন্ধ্যা বিভাগের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা গর্জে উঠলো কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বয়কট করলো প্রথম ও তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা। একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা সত্ত্বেও সেদিনের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি বলিষ্ঠ নীতির প্রশ্নে তৎকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষের সুচতুরভাবে পাতানো ফাঁদে পা না দিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেছিল। প্রায় তেতাল্লিশ বছর বাদে সেদিনের কথা লিখতে গিয়ে সে সমস্ত সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। ব্যতিক্রম ছিল দিবা বিভাগের হাতে গোনা মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র যারা একটি বিশেষ ছাত্র-সংগঠনের স্বার্থান্বেষী কিছু নেতার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। যদিও সেই বিভ্রান্তি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কেটে যায় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী তথাকথিত নেতৃত্বকে প্রত্যাখান করে তারাও এই সমবেত ছাত্র আন্দোলনে সামিল হয়।

কিন্তু ঘটনাটা কি ছিল। কি এমন ঘটেছিল যা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সেদিন এমন ভাবে নাড়া দিয়েছিল। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের কথাই বা বলি কেন। আমাদের কলেজের বিদগ্ধ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রীদের এই নীতিভিত্তিক আন্দোলনকে শুধু নৈতিক সমর্থনই নয় পরবর্ত্তীকালে সক্রিয় সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত - ছাত্র-ছাত্রীদের অতি প্রিয় ও অর্থনীতির একজন সুযোগ্য অধ্যাপক। কলেজ গভর্নি বডিতে অধ্যাপক - অধ্যাপিকাদের প্রতিনিধি। কলেজ শুরুর থেকে তিনি কলেজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সহকর্মীদের নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে অর্থসংগ্রহ করে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজকে উত্তর কলকাতার গর্বে পরিণত করতে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অধ্যাপক। কলেজের এই অন্যতম স্থপতি অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তকে অত্যন্ত অনৈতিকভাবে এবং স্বেচ্ছাচারিতার চরম নিদর্শন রেখে তৎকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের একথা অজানা ছিলনা যে অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তের নামে যাদু। তাঁর পড়ানোর যাদু, তাঁর উপস্থিতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আশার সঞ্চার করে। স্বাভাবিকভাবেই কলেজ কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছিল যে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুতেই এই বরখাস্তের আদেশ মেনে নেবে না। সেই জন্যই কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজে দশদিন ছুটি ঘোষণা করে এই ছুটির মধ্যে পীযূষবাবুকে বরখাস্ত করেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যেহেতু দশদিন ছুটির পর কলেজ খোলার দিন ২রা এপ্রিল, ১৯৫৯ এবং সেই দিনই বার্ষিক পরীক্ষার শুরু (যা কলেজ - কর্তৃপক্ষ ভেবে চিন্তে ঠিক করেছিলেন), ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় না বসে আন্দোলনের ঝুঁকি নেবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ কলেজ কর্তৃপক্ষের এই কৌশল ব্যর্থ হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা

বয়কট করে এবং এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। বিভিন্ন কারণে ছাত্র - আন্দোলনের ইতিহাসে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলন এক ঐতিহাসিক ছাত্র-আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

১) আন্দোলনের শুরু থেকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সুচতুর ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচার করা হয় যে, ঘটনাটি যেহেতু একজন অধ্যাপককে বরখাস্ত সম্পর্কিত, ছাত্র-ছাত্রীদের এই ব্যাপারে কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না। শুধু শুধু কলেজে পড়াশুনা বন্ধ করে আন্দোলন করলে ছাত্র-ছাত্রীদেরই ক্ষতি।

এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে ছাত্র-শিক্ষক স্বার্থ ও সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কোনও সুযোগ্য শিক্ষকের প্রতি কোনও অন্যায় অবিচার হলে তাঁর ছাত্রদের কর্তব্য সেই শিক্ষকের পাশে দাঁড়ানো এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। নীতিগত প্রশ্নে ছাত্র-ছাত্রীদের এই দৃঢ় অবস্থান ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল সংযোজন।

২) স্থায়িত্বের দিক থেকে এই ছাত্র-আন্দোলন ছিল ঐতিহাসিক। প্রায় দীর্ঘ দেড় মাস / দু মাস এই আন্দোলন চলেছিল।

৩) অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তের বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে এই আন্দোলন চলাকালীন অধ্যাপক ও ছাত্রদের দীর্ঘদিন অনশন ধর্মঘট যা ছিল অভূতপূর্ব।

৪) এই আন্দোলন ব্যাপকতার দিক থেকেও ছিল অপরিসীম গুরুত্বের। অভিভাবকেরা একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটি গঠন করে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন।

৫) কলকাতার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এই আন্দোলনের অংশীদার হন এবং এই আন্দোলন ও তার দাবীর প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে একদিনের ছাত্র-ধর্মঘট পালন করেন এবং মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেন।

৬) সেই সময়ের কিছু প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সংবাদপত্রের এই আন্দোলনের সম্বন্ধে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার ও অসত্য সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদে এবং সঠিক সংবাদ প্রকাশের দাবীতে আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিশাল মিছিল কলকাতার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রগুলির অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও সত্য সংবাদ প্রকাশের দাবী করে। এই ঘটনা আন্দোলনের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সত্যের প্রতি অবিচল থাকার এক ইতিহাস।

৭) ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপকমন্ডলী এবং অভিভাবকদের সমবেত আন্দোলনের চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে তৎকালীন উপাচার্য্য শ্রী নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তকে সসম্মানে কলেজে ফিরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেন

৮) এই ঘটনা প্রমাণ করে যে একজন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের প্রভাব কত ব্যাপক হতে পারে, যার জন্য এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকমন্ডলী তাঁদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে এক বিরাট ঝুঁকি নিতেও পিছপা হন না।

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আদর্শবাদিতা, অধ্যাপনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী চেতনা এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তাধারার দুর্নিবার আকর্ষণই এই বিশ্বাস আন্দোলন সংগঠিত হতে পেরেছিল। পীযূষবাবু চান আর না চান, সেদিনের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপকমন্ডলী ও অভিভাবকেরা ঐ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই অসামান্য ব্যক্তিটির ন্যায় নিষ্ঠার প্রতি তাঁদের সম্মান জানিয়েছিলেন বলেই আমি মনে করি। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী এই চির সংগ্রামী মানুষটির রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনে বিস্তার ছিল ব্যাপক, পীযূষবাবুর রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক নিয়ে বলার জন্য অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা বিস্তারিত বলতে পারবেন। আমি পীযূষবাবুর ছাত্র ছিলাম এবং একজন ছাত্রের চোখে তাঁকে যেমন দেখেছি, সে কথাই বলার চেষ্টা করছি।

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তকে আমি প্রথম দেখি ১৯৫৫ অথবা ১৯৫৭ কোন ও এক সময়ে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজেই; আমি তখন দিবা বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছি। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, গায়ের রং উজ্জ্বল ফর্সা, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ, ধবধবে সাদা পাঞ্জাবী আর ধূতিতে এক অপূর্ব তারুণ্যের দ্যুতিতে ভাস্বর। সেই তেজস্মান মানুষটিকে উপেক্ষা করা কারও সাধ্য ছিল না। উনি ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। অর্থনীতির তিনটি বিভাগ — সাধারন অর্থনীতি, ভারতের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এই তিনটি বিষয়েই তাঁর ছিল সমান ব্যুৎপত্তি বিশেষ করে রাষ্ট্র বিজ্ঞান পড়ানোর সময় তিনি এই কঠিন বিষয়টিকে সাহিত্যের পর্যায়ে নিয়ে যেতেন। প্রসঙ্গতঃ এই তিনটি বিষয়কে নিয়ে স্নাতকস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনি একটি বই লিখেছিলেন যা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি সম্পদ বিশেষ। আমার দুর্ভাগ্য সে সেই বইটি আমার কাছে আজ নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা ছাত্র-জীবনে অনেক ছাত্র-দরদী শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম যাঁদের মধ্যে অধ্যাপক দাশগুপ্ত ছিলেন উজ্জ্বলতম। এমন নিঃস্বার্থ ছাত্র-বৎসল মানুষ সত্যিই বিরল। আমার মনে আছে যখন আমরা আন্দোলনরত পীযূষবাবু তখন বরখাস্ত হবার কারণে প্রচন্ড আর্থিক সংকটে। আমরা, বিশেষভাবে সান্ধ্য বিভাগের ছাত্ররা যাদের মধ্যে অনেকেই তখন চাকরী জীবনে কর্মরত এবং কিছু রোজগার করছি, ওনাকে একটি কোচিং খুলতে অনুরোধ করলাম যেখানে আমরা ওনার কাছে অর্থনীতি পড়তে চাই। কিন্তু কার কাছে কি বলতে গিয়েছিলাম। উনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন আমাদের প্রস্তাব। বললেন, যদি কোনও ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে পড়তে চায় তারা সব সময়ই তাঁর কাছে আসতে পারে কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনও অর্থ তিনি নিতে পারবেন না— তারা যে তাঁর ছাত্র। অনেক অনুনয় করেও এ বিষয়ে তাঁর মত পাল্টাতে পারিনি। সেই সময়েই কিছুটা আর্থিক সংকটের সুরাহার জন্যও বটে তিনি অর্থনীতির উপর তাঁর বইটি লেখেন। আন্দোলন কিছুদিন চলার পর পীযূষবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নিজের

জন্য নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় ক্ষতি হচ্ছে। বারবার আমাদের বলেছেন আন্দোলন তুলে নিতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতি না হয়। কিন্তু সেই একবারই আমরা ওনার অবাধ্য হয়েছিলাম এবং ওনার ঐ নির্দেশ মানতে আমাদের অক্ষমতার কথা ওনাকে জানিয়েছিলাম কারণ পীযূষবাবুর এই অন্যায়ভাবে বরখাস্ত হওয়াকে আমরা মনের দিক থেকে কোনও দিন মেনে নিতে পারিনি। যদিও শেষ পর্যন্ত পীযূষবাবুর চাপে পড়েই আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যের নিকট পীযূষবাবুর পনর্বহালের মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে আন্দোলন তুলে নিই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি শুধু প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। একে কার্যকরী করার কোনও চেষ্টাই আমাদের চোখে পড়েনি। পীযূষবাবুর পুনর্বহাল হয়নি। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের আস্থা ও বিশ্বাসের কোনও মূল্য দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। পর বর্ত্তীকালে পীযূষবাবু কলকাতার নেতাজীনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন।

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কোনও মলিনতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন কম্যুনিষ্ট। পীযূষবাবুর বরখাস্তের প্রত্যক্ষ কারণ যদিও ছিল কলেজ-কর্তৃপক্ষের অধ্যাপক-স্বার্থ বিরোধী কাজ-কর্মের প্রতিবাদ করা কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস পীযূষবাবুর আসল অপরাধ ছিল — তিনি একজন কম্যুনিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আজ যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অযথা অভিযোগে সোচ্চার সেদিন তারা এবং তাদের পূর্বসূরীরা পরিস্কারভাবে বলতে গেলে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব একজন শিক্ষাব্রতী, ছাত্র-দরদী সুযোগ্য অধ্যাপককে শুধু কম্যুনিষ্ট হওয়ার অপরাধে ভাতে মারার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তাদেরই প্রভাবিত সেই সময়ের কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমবেত অমানুষিক ভূমিকা আমার ধারনাকে বদ্ধমূল করেছে। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি। কিন্তু একজন আদর্শনিষ্ঠ কম্যুনিষ্টকে এভাবে আদর্শচ্যুত করা যায় না। অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তীব্র আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েও নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে যে অধ্যাপক ছাত্র-স্বার্থকে বড় করে দেখেছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিক্ষা ব্যবস্থার সেদিনের উঁচুতলার ক্ষমতাধারী মানুষেরা এমন একজন শিক্ষাব্রতীর অতুলনীয় আত্মত্যাগের মূল্যই দিলেন না।

আজ অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর এই প্রয়াণে আমরা তাঁর ছাত্ররা হারালাম আমাদের এক অতি আপনজনকে আর সমাজ হারালো এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্বকে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে বহু ছাত্র-ছাত্রী কম্যুনিষ্ট আন্দোলন তথা বামপন্থী আন্দোলনের সাথী হয়েছিলেন। পরবর্ত্তীকালে, নানা আলোচনা সভা ও জনসভায় পীযূষবাবুর রাজনৈতিক বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন তিনি ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এক অন্যতম নেতা। তেমনই দৃপ্ত, তেমনই ভাস্বর।

আজ যখন ভারতবর্ষে এমন একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীন, কেন্দ্রীয় সরকার যার সুবাদে একজন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুবৃত্ত সমস্ত দেশকে লুণ্ঠন করছে, বিক্রী করে দিচ্ছে আমার দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে, স্বদেশ যখন আজ বিপন্ন — তখন পীযূষবাবুর মত মানুষের খুব বেশী প্রয়োজন। তিনি আজ নেই কিন্তু আছেন তাঁর উত্তরসূরীরা। তাঁর বড় ভালবাসার রাজনৈতিক দল সি. পি. এম — ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ আজ বামফ্রন্টের দীর্ঘদিনের দূর্গ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কিন্তু বসে নেই। বারবার ফণা বিস্তার করছে। কিন্তু এই দূর্জয় দূর্গ ভাঙ্গার সাধ্য কার, বিশেষ করে আজ যখন পীযূষবাবুর দীক্ষায় দীক্ষিত মানুষেরা ভারতবর্ষে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নেতৃত্বে সারা ভারতে বামপন্থী শক্তি দেশী - বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের বিরুদ্ধে এক সংগঠিত লড়াইয়ে সামিল এবং এই লড়াই চলবে যতদিন না আসে মেহনতি মুনষের শেষ জয়। আজীবন সংগ্রামী অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানোর সেই হবে প্রকৃষ্ট পথ।

কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রাণ কুমার মুখার্জী

কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের প্রয়াণে একটি মহৎ আদর্শ প্রাণের তিরোধান হল। শোকাহত চিত্তে অতীত দিনের স্মৃতিগুলি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। দীর্ঘ আট বছর সহকর্মী হিসাবে তাঁর সাহচর্য লাভ করেছি। তিনি ছিলেন এক সুযোগ্য শিক্ষক, সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতা। সুদর্শন, সুবক্তা ও নেতৃপদের দক্ষতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। এই গুণাবলী তাঁকে সহজে সবার কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। তাঁর ছিল মার্কসীয় আদর্শে গভীর নিষ্ঠা, রাজনৈতিক সততা, আপোষহীন সংগ্রামী মন। রাজনৈতিক কলুষের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল নিরলস সংগ্রাম। তাঁর এই সততা, নিষ্ঠা, আপোষহীন নিরন্তর প্রতিবাদ সতই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর মানসিক বল, আদর্শে নিষ্ঠা ও সততা হেতু তাঁকে নিয়ত দূর্নীতি পরায়ণ কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হত।

আদর্শপরায়ণ লোকের অভিশাপ হল তারা নিঃসঙ্গ। রাজনৈতিক পার্টি কিম্বা তাঁর সহকারী বন্ধুবর্গ ধীরে ধীরে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। রাজনৈতিক পার্টি ও সহকর্মীবৃন্দও কলুষ মুক্ত নয়। তাই আদর্শবান ব্যক্তির শুচিতা ও নিষ্ঠায় অস্বস্তি বোধ করে ও তাঁকে চরমপন্থী অ্যাখ্যা দিয়ে হীন আত্মতৃপ্তি বোধ করে। কমরেড পীযূষ দাশগুপ্ত এর শিকার হয়েছেন। এই শুচিশুদ্ধ আদর্শবান ব্যক্তি জীবনে সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁরা ব্যর্থ হবেন, পীযূষ দাশগুপ্তও ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু "he will always be remembered as one who made his life a lesson for all ages to come." তাঁর জীবনে যদি কিছু ব্যর্থতা থাকে তবে তা তাঁর মহত্ত্বের পরিমাপ।

শ্রদ্ধেয় পীযূষ দাশগুপ্ত আমার শিক্ষক হয়ে ওঠার শিক্ষক

অমিতাভ সেন

বেশ কয়েকবছর পড়াশুনার ছেদ পড়ার পর জেল থেকে বেরিয়ে তিপ্পান্ন সালে মনীন্দ্র কলেজে তখনকার ইন্টার মিডিয়েট প্রথম বর্ষে দেখা পেয়েছিলাম পীযূষদার। আমার অর্জিত বিষয়ের মধ্যে ছিল সিভিকস্ - ইকনমিক্স। আই এ পাশ করে আবার ঐ কলেজেই অর্থনীতি অনার্স। কাজেই পুরো চার বছর শিক্ষক হিসাবে পীযূষদাকে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন সুশ্রী অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত সকলের সঙ্গেই কথা বলতেন নম্রভাবে এবং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্বগুলি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর পড়ানোর ধারাটা ছিল অন্যরকম — দুর্বোধ্য তত্ত্ব এবং সূত্রগুলি অত্যন্ত সহজ সরলভাষায় সকলের বোধগম্য করে বুঝিয়ে দিতেন এবং একেবারে মনের গভীরে তার স্থান করে দিতেন। যৌবনসুলভ চঞ্চলতায়, কলেজের ছাত্র ফেডারেশন কর্মী হওয়ার সুবাদে অনেক দিন অনেক অধ্যাপকের ক্লাসে যাইনি। পীযূষদার ক্লাসও কখনো ফাঁকি দিয়েছি। ওঁর ক্লাস কামাই হলে মনে হোত কিছু একটা হারিয়েছি।

কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনি হবার পর নিবর্তনমূলক আটক আইনে পীযূষদা গ্রেফতার হয়েছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমিও জেল থেকে বেরিয়ে আবার ছাত্র হয়েছিলাম। পীযূষদা অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন বলেই তাঁর সহস্রাধিক ছাত্রের তার সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কলেজে পীযূষদা কেবল আমাদের মাষ্টার মশাই ছিলেন না, ছিলেন অভিভাবকও। তিনি নিজে ছিলেন মার্ক্সবাদী, কিন্তু ক্লাসের চৌহদ্দীতে সমস্ত ছাত্রই ছিল তার ছাত্র, সেখানে রাজনৈতিক বিভাজন তিনি মানতেন না। পরীক্ষার ফি দিতে না পারলে ছাত্ররা দুজন অধ্যাপকে কাছে যেতেন — পীযূষদা আর নন্দবাবু।

কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের কাছ থেকে পরীক্ষায় দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে অজিতের (অজিতেশ) পরিচালনায় ব্রেমব্রাউন হলে ইবসেনের 'ডলস্ হাউস' নাটক অভিনয় করার জন্য নাটকের কপি - লালবাজারে জমা দিতে হয়েছিল। কপিটি সরবরাহ করেছিলেন পীযূষদা, তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত পুস্তকের ভান্ডার থেকে। বলেছিলেন বইটি অবশ্যই ফেরৎ দেবে, কিন্তু দেওয়া যায়নি। কারণ লালবাজার থেকে বইটি ফেরৎ পাওয়া যায়নি। এই ক্ষতি তিনি হাসি মুখে সহ্য করেছিলেন। ঐ নাটকেরই সর্বোচ্চ টিকিট বিক্রীর প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের জন্য বই দিয়েছিলেন পীযূষদা। যে সমসা নিয়েই তার কাছে আমরা যেতাম - তিনি আমাদের পরামর্শ দিতেন — এমনকি ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কেও।

কিছুই নেই এমন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে কলেজ গড়ে তোলার ব্যাপারে পীযূষদার অবদান আজও সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। কর্তৃপক্ষের যে কোনো রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে টিচার্স কাউনশিলে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সোচ্চার। প্রাত বিভাগের অধ্যক্ষ দিকে অন্যায় ভাবে পদচ্যুত করার বিরুদ্ধে তাঁর অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে তিনি ছিলেন অটল, এবং সেই সংগ্রাম তিনি করেছিলেন। প্রাত, দিবা, সান্ধ্য বিভাগের ১৯৫৭ সালে কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ে ঘোষনার পরে দেখা যায় অধিকাংশ আসনে ছাত্র ফেডারেশনের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। ছাত্র ফেডারেশনের নিশ্চিত জয় রুখতে অন্যায় ও অগণতান্ত্রিকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন বাতিল ঘোষনা করে। অজুহাত দেওয়া হয়, কলেজের দেওয়ালে পোষ্টার লাগানোর অভিযোগে নির্বাচন বাতিল হয়েছে। আজকের সময় এরকম ঘটনা চিন্তাও করা যায় না। এই সময়ে পীযূষদা আমাদের পরামর্শ দেন কোনো রকম হঠকারীতা না করে ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। ক্রুদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা শান্ত করেছিলাম। আমরা আদালতেও যাইনি। আবার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে ওঠা সংগঠন প্রাক্তনীর পক্ষ থেকে আমরা পীযূষ দাশগুপ্ত এবং অন্য কয়েকজন প্রবীন অধ্যাপককে সম্বর্দ্ধনা জানাই। সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় তিনি প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কলেজ গড়ে ওঠার এবং কলেজের ঐতিহ্যের কথা সুন্দর ভাবে বলেন। তাঁর প্রিয় শিক্ষায়তনে এটাই ছিল তার শেষ ভাষণ।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যোগ থাকার সুত্রে কলেজের ও অধ্যাপনার বাইরেও পীযূষদার সাথে আমার যোগাযোগের ক্ষেত্র ছিল। সেউ সূত্রে দুবার পীযূষদার সাথে একছাদের তলায় রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা আমার অমূল্য সঞ্চয়। একবার ভুল চিকিৎসার ফলে পীযূষদার জীবন সংশয় হয়েছিল। অজ্ঞান ও সংকটজনক অবস্থায় পীযূষদাকে প্রয়াত ডঃ বিনয় ভট্টাচার্য্যের অধীনে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিলো। অপারেশনের প্রয়োজন হয়েছিল এবং অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়েই ডঃ ভট্টাচার্য অপারেশন করেছিলেন। অপারেশন সফল হয়েছিলো — কিন্তু দীর্ঘদিন উনি দুর্বল ছিলেন। সেই সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তণের জন্য তিনি কিছুদিন ঝাড়গ্রামে কাটান। আমি ঝাড়গ্রামে একটি কাজে গিয়েছিলাম। অসুস্থ মাষ্টার মশাইকে দেখতে গিয়েছিলাম উনি আমাকে অন্য কোথাও থাকতে দেননি — বলেছিলেন তুমি এখানেই থাকবে। মাষ্টার মশায়ের আদেশ অমান্য করতে পারিনি একরাত তাঁর সঙ্গে একই ঘরে ছিলাম। মাষ্টার মশাই ও ছাত্র অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম।

দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে। জলপাইগুড়ি জেলায় মাল বাজারে এ.বি.টি-এর জেলা সম্মেলন উপলক্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা সভায় তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা। আমি কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলাম। একই সঙ্গে তখনকার চালু 'জামেয়ার' বিমান কোম্পানীর বিমানে গিয়েছিলাম এবং ফিরেছিলাম। সম্মেলনের শেষে আমরা স্কুলের মাঠে চেয়ার পেতে গোল হয়ে বসে গল্প

করছি। খানিকবাদে জলপাইগুড়ি ফিরবো — পরদিন সকালে কলকাতা। জীপের ড্রাইভার গিয়েছে পেট্রল আনতে। কিন্তু ড্রাইভার সে রাতে আর ফিরলো না। ফিরলো পরদিন ভোর রাতে। ফিরতে পারেনি কারণ পেট্রল নিয়ে ফেরার পথে সে দেখেছিলো হাতির দল রাস্তা জুড়ে আছে। তারা চলে যাওয়ার পর ফিরতে হয়েছে। সে রাতে একজন মাষ্টার মশাই-এর কোয়ার্টারে একটা বড় চৌকিতে মাষ্টার মশাই ও ছাত্র পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটিয়েছিলাম।

১৯৬৯ সালে চীন ভারত সীমান্ত বিরোধের সময় পার্টির নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর সাময়িক কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়াত কমরেড গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়েছিলো। গোপন এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন পীযূষদা। তিনি পার্টির শিক্ষক ফ্রন্টের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। সেই সূত্রে প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের প্রয়াত নেতা মন্মথ অধিকারীর বাড়িতে আমরা মাঝে মাঝে মিলিত হতাম। আত্মগোপন অবস্থায় পীযূষদাকে সেই সময়ে অনেক কাছে থেকে দেখেছি।

পরবর্তী কালে পার্টির সাথে তাঁর বিচ্ছিন্নতায় বেদনা অনুভব করেছি। পার্টি থেকে তাঁর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সমর্থন করতে পারিনি। সরোজদা যখন রাজ্য পার্টির সম্পাদক — শুনলাম তিনি আবার পার্টির কাছাকাছি এসেছেন এবং তাঁর অসুস্থতা সত্বেও পার্টির লেখা-পড়ার কাজে নিজেকে সংযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন — তখন খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।

পীযূষদা তাঁর জীবনাবসানের কয়েক মাস আগে কলকাতায় তাঁর বড় ছেলের বাড়িতে এসেছিলেন। খবর পেয়ে আমি এবং আমার কলেজের সহপাঠিনী নূপুর অধিকারী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাদের সাথে তাঁর দীর্ঘক্ষণ অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সকলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সেদিন তার হৃদ্ধিক ব্যবহার কখনো ভুলবোনা। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। সেদিন মনে হয়েছিলো আমরা কথা বলছি আমাদের বহু দিনের পুরানো কোন বন্ধুর সাথে।

কলেজ ছাড়ার পর পরবর্ত্তী জীবনে আমি শিক্ষকতাকে আমার পেশা হিসাবে গ্রহন করি। আমার বিষয়ও ছিল অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ছাত্র থেকে শিক্ষক হয়ে ওঠার বিবর্ত্তনে আমার শিক্ষক পীযূষদা। কেবল বিষয়েরই নয়, মানবতারও শিক্ষক। আমার শ্রদ্ধার অধিকারী হয়ে তিনি থাকবেন, যতদিন আমি থাকবো।

পীযূষ দাশগুপ্ত স্মরণ, মনন

অজয়কুমার ঘোষ

সদ্য বিগত যুগের অত্যুজ্জ্বল কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিতর্কিত, দুঃখজনকভাবে পার্টি-বহির্ভূত, একাধারে বিশ্রুত অধ্যাপক, বিশিষ্ট বক্তা, লেখক ও বুদ্ধিজীবী, সদ্য প্রয়াত পীযূষ দাশগুপ্ত সম্পর্কে কিছু লেখার যোগ্যতা আমার মতো অখ্যাতজনের নেই। কারণ, তিনি যে-জাতীয় কমিউনিষ্ট এবং যে ধরনের মানুষ ছিলেন, তার মূল্যায়ন করার যোগ্যতা সকলের থাকে না। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য।

দ্বিতীয়ত তাঁর সম্পর্কে বড়সড়ো কোনো স্মৃতিকথা লিখব তেমন কোন পুঁজিও আমার নেই। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগসূত্র অতি সামান্য, অনেকটা জ্যামিতির স্পর্শকের মতো বিন্দুময়। যদিও তাঁর ভাই বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক শঙ্কর দাশগুপ্ত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র দীর্ঘকালের। জন্ম ও শিক্ষাবর্ষগত দিক থেকে আমরা প্রায় সমানবয়সী। কিন্তু পীযূষদার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার তেমন সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়নি।

তবু অতি সামান্য কিছু স্মৃতিকথা অমেয় সম্পদ রূপে রয়ে গেছে।

আজ, তাই, বিতর্ক নয়, মনোনিবেশ, তৎসহ সামান্য কিছু স্মৃতি এবং অসামান্য শ্রদ্ধা নিয়েই আমার এই অকিঞ্চিৎকর লেখা। পুঁজির স্বল্পতা হেতু কিছু নিজের কথা, কিছু অন্যের কথা, কিছু সেকালের কথা হয়তো এসে যেতে পারে। এ সম্পর্কে আমি সচেতন এবং সচেতন বলেই ঈষৎ কুণ্ঠিত এবং মার্জনা প্রার্থী।

পীযূষ দাশগুপ্তকে বুঝতে গেলে সে-যুগের পটভূমির সামান্য একটু পরিচয় দান বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

চল্লিশের দশকের শেষভাগ। তখন এমন একটা সময় ছিল যখন কমিউনিস্ট পার্টির আজকের মতো এমন 'বাড়-বাড়ন্ত' ছিল না। পার্টি তখন বে-আইনি। হাতে গোনা কয়েকজন কমিউনিস্টকেই দেখা যেত। তাঁরা যেমন লেখায় পড়ায় ভালো, যেমন আচার - আচরণে ভদ্র, তেমনি আত্মনিবেদনে একনিষ্ঠ। পীযূষ দাশগুপ্ত সেই ঘরানার কমিউনিস্ট।

আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। থাকি ভবানীপুরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল শেষ হয়েও শেষ হয়নি। জনযুদ্ধ, ভারত ছাড় আন্দোলন, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ (পরে প্রগতি লেখক সংঘ) পঞ্চাশের মন্বন্তর, গণনাট্য সংঘের নবান্ন, ছেঁড়াতার, উলুখাগড়া, পথিক, আজাদ হিন্দ ফৌজ, নৌ-বিদ্রোহ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা (১৬ আগস্ট, ১৯৪৬) মেট্রোর সামনে ডাক-তার ধর্মঘটের

দিন রামেশ্বর-হত্যা, রসিদ আলি দিবস ইত্যাদি ঘটনা - দুর্ঘটনা নিয়ে কলকাতা তখন উত্তাল। আমরা তার সাক্ষী। পাড়ার জগুবাজারে রূপালী সিনেমা হলে তখন রমরমিয়ে চলছে জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে'। এই পরিবেশেই আমরা বড়ো হয়েছি।

পাড়ায় কমিউনিস্ট বলতে তখন দু এক জনকেই চোখে পড়তো। পাড়ার লোকে তাঁদের কালেভদ্রে দেখতে পেতো এবং দেখতো সভয়-সম্ভ্রমের চোখে। কারণ, তখন জাতীয়তাবাদী ভাবান্দোলনের ডামাডোলে কমিউনিস্টরা ছিলেন জনরোষের শিকার। যখন-তখন তাঁদের কপালে জুটতো পুলিশের ব্যাটন, জনতার ইট-পাটকেল, আর শাপান্ত - বাপান্ত গালি-গালাজ। দেশদ্রোহী, বিভীষণ, রাশিয়ার দালাল, পুলিশের চর ইত্যাতি বিশেষণ ছিল জিভের ডগায়।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পীযূষ দাশগুপ্তের মতো সে-যুগের কমিউনিস্টরা পার্টির আদর্শ ও পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছিলেন। তাই, দুর্ভিক্ষে, দাঙ্গায় দেখেছি কমিউনিস্টদেরই এগিয়ে যেতে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গর খানা চালাতে, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত পল্লিতে পল্লিতে সাহস করে শান্তি ও সম্প্রীতির মিছিল বার করতে।

পীযূষ দাশগুপ্ত ছিলেন তাঁদের একজন। এর আগে ফ্যাসিসট দস্যুদের হাতে ঢাকার রাজপথে সোমেনচন্দের মৃত্যু হয়েছে, স্বাধীনতায় সুকান্ত ভট্টাচার্য নামে এক কিশোর কবির কবিতা বেরোচ্ছে। পরিচয়ে ও নতুন সাহিত্যে প্রকাশিত হচ্ছে সুভাষ মুখোপ্যাধ্যায়ের কবিতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প লেখা হয়েছ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান, পরবর্তী কালে মধুবংশীর গলি এবং আরও পরে শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি। ইতিমধ্যে (১৯৪৭) সুকান্তর মৃত্যু, মৃত্যুর পর 'ছাড়পত্র' কাব্যের প্রকাশ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র উৎপল দত্তের ইংরেজি নাটকের অভিনয় (দু এক বছর পরেই 'মাইকেল' চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব), শম্ভু ভট্টাচার্যের রাণার নৃত্য, শম্ভু মিত্রের বহুরূপী — তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের দুর্ধর্ষ অভিনয়। অপর দিকে কলকাতার পাবলিক থিয়েটারে শিশির ভাদুড়ি ও অহীন্দ্র চৌধুরীদের নাট্যাভিনয়, পাশাপাশি কংগ্রেস সাহিত্য / সংঘের অকিঞ্চিৎকর দূর্বল প্রযোজনা, সাহিত্যে তারাশঙ্কর - বিভূতিভূষণ , বনফুল, সদ্য জনপ্রিয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক প্রমুখের রচনা, সাংবাদিকতায় সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ সেনের মতো ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি — সব মিলিয়ে সে এক ভিন্ন কলকাতা, সে এক অন্য পরিবেশ। অন্য, কিন্তু অনন্য।

তখন এমন কোনো কমিউনিস্টকে দেখিনি যিনি দেশবিদেশের কমিউনিস্ট পত্র-প্রত্রিকা ছাড়াও কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, ডাস্ ক্যাপিতালের প্রাপ্তিযোগ্য সংস্করণ, মার্কসর অন্যান্য রচনা, এঙ্গেলসের লেখা, লেনিন - স্ট্যালিনের বই, ১৯৪৯ সনের পর লোক মাও-সে-তুং-এর, ON CONTRADICTION, ON PRACTICE, এমিল বার্ণস-এর বই, অমিত সেনের ইতিহাসের ধারা, জুলিয়াম ফুচিকের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' ইত্যাদি বই পড়েনি তখন কমিউনিস্টদের হাতে হাতে ঘুরতো রজনী পাম দত্তের 'আজিকার ভারত', কডওয়েলের Illusion and Reality গোপাল

হালদারের সংস্কৃতির রূপান্তর। এছাড়া রাল্ফ্ ফক্সের বই, জে.ডি. বার্নাল, জে. বি. এস হ্যালডেন প্রমুখ অনেকের লেখা বই-ই তাঁরা নিয়মিত পড়তেন। সেকালের কমিউনিস্টদের হাতে দেখেছি উপরি-কথিত বইগুলি ছাড়াও লেনিনের State and Revolution, টলস্টয় - গোর্কি-টমাস-ম্যানের বই। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ থেকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় লেখালেখির তাঁরা খোঁজ খবর রাখতেন।

পীযূষ দাশগুপ্ত সেই যুগের কমিউনিস্ট

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমাদের ভবানীপুরের রাস্তায় প্রায়শঃ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আসতেন ডঃ অমলেন্দু গুহ। তিনি সম্পর্কে আমার মাতুল। তাঁর মুখেই প্রথম পীযূষ দাশগুপ্তের নাম শুনি। তখন অবশ্য তিনি প্রেসিডেন্সিতে পড়েন। অর্থনীতির কৃতী ছাত্র। পীযূষ দাশগুপ্তের ভাই অকাল প্রয়াত অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্তের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। এ ছাড়া, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, হীরেন দাশগুপ্ত প্রমুখ সে-যুগের তরুণ অথচ উজ্জ্বল কমিউনিস্টদের নামও তাঁর মুখেই শুনি। আর বড়োদের মধ্যে গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, হীরেন মুখোপাধ্যায়, ভূপেশ গুপ্ত, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, বিণয় চৌধুরী, জ্যোতি বসু, সরোজ মুখোপাধ্যায়, জলিকাউল, মনিকুন্তলা সেন এবং সর্বোপরি মুজফ্ফর আহমদ, আব্দুল হালিম — এঁদের নাম তো শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর মুখেই বারবার উচ্চারিত হতে শুনেছি।

ডঃ অমলেন্দু গুহর মধ্যে দেখেছি খাঁটি কমিউনিস্টের যাবতীয় লক্ষণ, যেমন তাঁর পড়াশোনার বহর, তেমনি, তাঁর বোঝানোর পদ্ধতি, তেমনি তাঁর ধৈর্য্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা। মনে আছে ১৯৪৭ সনের কোনো এক সময়ে। তিনি সদ্য প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি বইটা কিনে নিয়ে এলেন, মোটা হ্যান্ডমেড পেপারে ছাপা, খাটো সাইজের বই। পুরো কবিতাটা পড়ে শোনালেন। তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন। রাম বসু, দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর একটা কবিতার বই বেরিয়েছিল। নিজেও বাংলা, অসমীয়া ও ইংরেজিতে প্রচুর লিখেছেন, কবিতা, ভ্রমণ ও প্রবন্ধ। তিনি আসাম তেজপুর দড়ং কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর মাধ্যমে আর একজন খাঁটি কমিউনিস্টের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তাঁর কলেজের একদা সহকর্মী অধ্যাপক হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য পীযূষ দাশগুপ্ত যে-যুগের কমিউনিস্ট, সেই যুগ - পরিবেশটা সাধ্যমতো একটু তুলে ধরার চেষ্টা।

অত্যল্পকালের মধ্যেই পীযূষ দাশগুপ্ত সেযুগের তরুণ কমিউনিস্টদের নামের তালিকায় পুরোভাগে এসে পড়লেন। তারপর বে-আইনি যুগে কিভাবে পার্টির দায়িত্বে ছিলেন, পরে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির দায়িত্বভার পেয়েছিলেন, কিভাবে কাকাবাবু মুজফফর আহমদের স্নেহ-বিশ্বাস-আস্থা অর্জন করেছিলেন, অধ্যাপক হয়ে কিভাবে শুধু আপোসহীন কমিউনিস্ট হওয়ার অপরাধে একের পর এক চাকরি খুইয়েছেন, কিভাবে ছাত্র অধ্যাপকদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। গ্রামে

শহরে ঘুরে কাছে কি অক্লান্তভাবে একের পর এক পার্টি ক্লাস করে গেছেন সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।

তারপর কলকাতা ছেড়ে আমাকে খড়দহ অঞ্চলে চলে যেতে হয়। তখন মাঝে মধ্যে দু একটা সভা-সমিতিতে তাঁকে দেখেছি। পথেঘাটে বা পার্টি অফিসে কিংবা স্বাধীনতা পত্রিকার অফিসে কোনো প্রয়োজনে গেলে হয়তো মাঝে মধ্যে দূর থেকে তাঁকে দেখেছি। যতদূর মনে আছে ১৯৫৩ সনে স্তালিনের মৃত্যুর খবর পেয়েই স্বাধীনতা পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা (বুলেটিন) বেরিয়েছিল, সেটি নিয়ে পীযূষ দাশগুপ্ত, কল্যাণ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন মিছিল বার করেছিলেন। আমিও সে মিছিলে ভিড়ে গিয়েছিলাম।

১৯৫৩ সনেই প্রগতি লেখক সংঘের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রামমোহন লাইব্রেরিতে। বারাকপুর মহকুমা থেকে সে সম্মেলনে আমি এসেছিলাম। কলকাতা থেকে আমার সহপাঠীবন্ধু লেখক কৃষ্ণ চক্রবর্তীও এসেছিলেন। সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায়, অতুল বসু, গোপাল হালদার প্রমুখ। প্রকাশ্য সম্মেলন হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। মঞ্চের পাশেই ন্যাশনাল বুক এজেন্সির স্টল। আর সে স্টল বইপত্রের নীরব নিরলস দায়িত্বে ছিলেন এক সুদর্শন যুবক — তিনিই পীযূষ দাশগুপ্ত ১৯৫৪-৫৫ সনে মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজে প্রায়ই যেতাম রবীন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে। তখন পীযূষদা ওই কলেজে পড়াচ্ছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখেছি একেরপর এক ক্লাস নিয়ে যেতে। সে কলেজ থেকেও তাঁর চাকরি চলে গেল, তাও দেখেছি। তার আগে কি তার পরে স্কটিশচার্চ কলেজেও তিনি কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। সেখান থেকেও তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে। নেতাজীনগর কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালন তাঁর হাতে হলেও সেখান থেকেও তাঁকে বিদায় নিয়ে চরম নিরাপত্তা হীনতার মধ্যে পড়তে হয়, ইতিমধ্যে পার্টি থেকেও তাঁকে চলে আসতে হয়েছে। সে এক ভয়াবহ সময়, সংসার-নির্বাহই তখন কঠিন হয়ে ওঠে। একদিকে মামলা-মোকদ্দমা, অন্য দিকে অস্তিত্বরক্ষার সমস্যা। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়। সে সময় তিনি ক্যাপিটাল মহাগ্রন্থের অনুবাদ-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কি মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস কি অমানুষিক শ্রম ও নিষ্ঠা! পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক বিরল দৃষ্টান্তের নিদর্শন। সে গ্রন্থ তিনি শেষ করে গেছেন, প্রকাশিতও হয়েছে। তার বিক্রীও হয়েছে, প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতও হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতির পথে। এই মহাগ্রন্থের বিরল-দৃষ্টান্ত অনুবাদ-কর্মের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন। এছাড়াও তাঁর সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

ভাগ্যচক্রে বা দশচক্রে বিড়ম্বিত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়তে না হলে আরও অনেক কাজ তিনি করে যেতে পারতেন।

অধ্যাপক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও ছাত্রপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। পার্টি-ক্লাস নেবার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আজও ইতিহাস বা কিংবদন্তী হয়ে আছে। মার্কসবাদের দুরূহতত্ত্ব প্রাঞ্জলভাবে বোঝানোর ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রবাদ-প্রতিম। তাঁর ইংরেজি-বাংলা লেখায় ও ভাষণে সেই স্বচ্ছতা ছিল

যা অনেকের মধ্যে দুর্লভ।

পরিশেষে একটু ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা বলা যাক। ১৯৭০ সন। তখন কৃষ্ণনগরে থাকি। কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে পড়াই। কলেজের এস. এফ.আই ছাত্র-সংগঠন লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করল। পীযূষদা প্রধান বক্তা. তারিখটা মনে আছে। ১৯৭০ সনের ২১ শে সেপ্টেম্বর। আগে থেকেই ঠিক ছিল আমার বাড়িতে উঠবেন এবং খাওয়া-দাওয়া সেরে বক্তৃতা করতে যাবেন।

কিন্তু তখন সন্ত্রাসের যুগ। ইন্দিরা গান্ধীর দৌরাত্ম্যে সারা দেশে অস্থিরতা। ঘাতকবাহিনী রাস্তায় নেমে পড়েছে। যখন-তখন নকশালের ছদ্মবেশে কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনী নিরীহ লোকদের খুন করছে। তারপর হঠাৎ কারফিউ, পুলিশের কুম্বিং অপারেশন বা চিরুনি তল্লাসি, ধরপাকড় ইত্যাদি ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার।

সেদিন কৃষ্ণনগর এল. সি. কলেজের ছাত্র এবং এস. এফ. আই কর্মী প্রশান্ত সরকার সাইকেল চড়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। সি. এম. এস স্কুলের সামনে কংগ্রেসের ঘাতকবাহিনী নকশাল সেজে তাকে খুন করল। তখন বেলা প্রায় ১১টা। বাংলাদেশে প্রশান্ত সরকারই সম্ভবতঃ সে-আমলের প্রথম ছাত্র শহীদ। হঠাৎ কারফিউ নেমে এল। দোকানপাট ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তা জন শূন্য। মিলিটারি নেমে পড়ল। কলেজের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল।

পীযূষদা সকালেই আমার বাড়ি পৌঁছে গেছেন। আমার স্ত্রী তাঁর স্কটিশের ছাত্রী। তার হাতের রান্না খেয়ে তৃপ্ত হলেন, পুরনো দিনের অনেক কথা, অনেক গল্প হচ্ছিল, সভায় যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, এমন সময় ছাত্র-হত্যার দুঃসংবাদ এল। তারপর কারফিউ ইত্যাদি।

সন্ধ্যা নাগাদ খানিকক্ষণের জন্যে কারফিউ শিথিল করা হলো। সেই অবসরে পীযূষদাকে নিয়ে আমরা কোনোরকমে কৃষ্ণনগর স্টেশনে পৌছলাম। সঙ্গে ছিলেন মৌলানা আজাদ কলেজের জনৈক অধ্যাপক এবং কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী মিহির দাশগুপ্ত। মিহির এখন টেলিফোন কর্মী ইউনিয়নের নেতা, N.B.A. -র কর্মী বাদল দাশগুপ্তের সে ছোট ভাই। পীযূষদাকে নিয়ে আমরা তিনজন কথা বলতে বলতে একেবারে তাঁর সঙ্গে শিয়ালদহ পর্যন্ত চলে এলাম। একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে সে রাত্রি ভবানীপুরের বাড়িতে থেকে গেলাম।

তারপরের ঘটনা তো প্রায় সকলেই জানেন। ১৯৭৪ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের যে সংগ্রাম সে হল আত্মরক্ষা, অস্তিত্বরক্ষা ও আত্ম মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম। সে সংগ্রামে তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই সংগ্রাম চলাকালেই ক্যাপিটাল-এর মতো মহাগ্রন্থের অনুবাদ তিনি শেষ করেছেন। কিন্তু ক্লান্ত বিধ্বস্ত জীবনে আর সে কর্মশক্তি ফিরে পেলেননা। ভিতরে ভিতরে জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসছিল আমার সঙ্গে শেষ দেখা শঙ্করবাবুর বাড়িতে বোধ হয় ১৯৯৪ সনের কোনো এক সময়ে। দেখলাম আমাদের তরুণ বয়সের দেখা সেই সুদর্শন যুবক আজ ক্লান্ত,

অবসন্ন, সেই দেহশক্তি নেই, বয়সের ভারে ও কালের প্রহারে আজ তিনি বিক্ষত। তবু অন্তর্গত চেতনার দীপ্তিতে মুখ চোখ তখনও উদ্ভাসিত।

শঙ্করবাবুর কাছে মাঝে -মধ্যে খবর পেতাম যে বাঙ্গালোরে ছেলের কাছে থাকেন, নাতিদের নিয়ে দিন কাটে, কিন্তু যে আদর্শের অগ্নিদীপ্তি তাঁর মধ্যে ছিল, তাতেই নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করে অবশেষে তিনি চির বিদায় নিলেন।

দুঃখ থেকেই যায়, পীযূষ দাশুগুপ্তের মতো বিরল - দৃষ্টান্ত অত্যুজ্জ্বল কমিউনিস্ট ব্যাক্তিত্বকে এমন ভাবে চলে যেতে হল !

আজ পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রচার ও প্রসার, জনপ্রিয়তা ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও সেতুলনায় গুণগত মান কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আর তখনই মনে হয় পীযূষ দাশগুপ্তের মতো কমিউনিস্টদের আজ বড়ো প্রয়োজন ছিল।

আমাদের দূর্ভাগ্য যে পীযূষ দাশগুপ্তের মতো কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আমাদের যা নেবার ছিল, তা আমরা নিতে পারিনি এবং সারা জীবনের আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মের বিনিময়ে তাঁর যেটুকু মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল, তাও আমরা দিতে পারিনি।

এ আক্ষেপ থেকে যাবে।

In Memorium - Piyus Dasgupta

Suprabhat Sen Gupta
Ex. Head of the Department
Department of History, Basirhat College.

Piyusda, as I used to call him reverently, was well known to me. For several years, I have had the honour of being in close proximity to him. In politics, he was a man of 'Left' leaning with a pronounced Marxist bias. Endowed with an uncommon gift of the gab, he would carry away everthing before his audience when he takes up any burning issue. His oratory was proverbial. As an exponent and advocate of Marxian Socialism, he had hardly any equal, for he had chewed, swallowed and digested the monumental work of Karl Marx - Das Capital and had even published a Bengali version of that book - a very daring endeavour for any academician indeed.

His other attributes were no less. He was clear, courageous and unyielding in his conviction and was prepared to undergo any sacrifice in defence of his doctrine. Mundane consideration of any sort (which is proverbial now-a-days) was countrary to his usage, repugnant to his feeling. Total dedication to the ideology he subscribed to was the redeeming feature of this redoubtable revolutionary. Yet, he was above all a humanist from the core of his heart. To him humanism and humanness were inseperable parts of any political doctrine and he always endeavoured to match his words with deeds. Profession and practice never fell apart in his case. Herein lay his innate strength.

The rigours of hazardous life and incarceration could not break his dawntless spirit, but they indubitably told upon his health. Yet he struggled on with unabcted vigour in pursuit of the ideal he stood for and fought for. And so, to my mind, Piusda would be remembered and appreciated by men of all ranks, as long as Socialist, or more properly, Humanist ideas and ideals permeate man's mind and heart.

'May his tribe increase'!

পার্টি করতে গিয়ে পীযূষদাকে যেরকম দেখেছি

অভয় ঘোষ / বাগবাজার

কিছু মানুষ আছেন যাঁদের দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে যায়। পীযূষদা ছিলেন এমনই একজন। পীযূষদার সঙ্গে আমার পরিচয় ছয়ের দশকের মধ্যভাগে। প্রথম দেখা থেকেই মানুষটিকে ভালবেসে ফেলেছিলুম, বড় দাদার মত শ্রদ্ধা করেছি, পক্ষান্তরে পেয়েছি স্নেহ ভালবাসা পরামর্শ। পীযূষদাকে ভাল লাগার কারণগুলি ছিল — সর্বদা স্মিত হাসি, উন্নতললাট, সুমধুর বাচনভঙ্গী, অপরের কথা শোনার অপরিসীম ধৈর্য্য এবং পরিশেষে সমস্ত বিষয়টিকে মার্কসবাদের আলোতে ব্যাখ্যা করা।

১৯৬৭ সালে বিধান সভা নির্বাচনে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাঃ)-র কাশীপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার পর ঘনিষ্ঠতা লাভ করি। তখন থাকতেন পশুপতি বোস লেনে, তারপর নন্দলাল বোস লেনে চলে আসার পর পীযূষদার বাড়ী আমার বাড়ী ঘর হয়ে যায়। ১৯৬৭-র নির্বাচনে পরাজয়ের পর পীযূষদাকে দেখেছি একজন সঠিক কমিউনিষ্টের ভূমিকায়। পরাজয়ে হতাশ না হয়ে চোখের জলকে বারুদে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা দেখেছি পীযূষদার বাগ্মীতায়। আমার মত অসংখ্য কমরেড আজও মনে করেন কমরেড পীযূষ দাশগুপ্তের মত এমন সহজ সরল সুন্দর মার্কসবাদের মৌলিক তত্বগুলির ব্যাখ্যা আর কাউকে করতে শুনিনি। ব্যাখ্যাই সব নয় পার্টিতে তার প্রয়োগেও পীযূষদার দৃষ্টি ছিল সজাগ। আমাদের এলাকায় ছোট একটা কারখানায় গড়ে উঠল ইউনিয়ন। পীযূষদা হলেন প্রথম সভাপতি। সদাব্যস্ত পীযূষদার পরামর্শ থেকে ইউনিয়ন কোন দিনও বঞ্চিত হয়নি। পীযূষদার প্রেরণায় এলাকার কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল বাগবাজারের একমাত্র সাংস্কৃতির শাখা "মৌসুমী গ্রুপ" সলীল চ্যাটার্জীর বাড়ীতে, গ্রুপটি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে শ্রেণী সংগ্রামের নাটক মঞ্চস্থ করে এবং গান গেয়ে জয় করেছিল দর্শকের মন। বাগবাজার এলাকায় মহিলা সমিতির সংগঠন ছিল মজবুত। প্রয়াতা কমরেড ইরা শর্মা, প্রয়াতা কমরেড আশা চক্রবর্তী এবং এখনও যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমরেড কল্যাণী ব্যানার্জী, কমরেড জয়ন্তী ব্যানার্জী সকলেই পীযূষদার কাছে পরামর্শ গ্রহন করতেন এবং পীযূষদাও এলাকার মহিলাদের সংগঠিত করার জন্য বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। আমি বলতে চাইছি কমরেড পীযূষ দাশগুপ্ত কেবলমাত্র মার্কসবাদী তাত্বিকেই ছিলেন না একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন।

পীযূষদাকে পার্টি ক্লাস ও সাধারণ সভা করতে বিভিন্ন জেলায় যেতে হত। আমার সুযোগ হয়েছিল পীযূষদার সঙ্গে ও রকম কয়েকটি সভায় থাকার। আমার অভিজ্ঞতা যারা তাঁর আলোচনা শুনেছেন তারা একটা চেতনা লাভ করেছেন। মার্কসীয় অর্থনীতি ছিল পীযূষদার নখদর্পণে, না হলে কার্লমার্কসের "ক্যাপিটালের" বঙ্গানুবাদ করতে পারতেন না, যা আর কেউ করেছেন বলে

আমার জানা নেই। শুধু মার্কসীয় অর্থনীতি নয়, সমাজনীতি সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি, মে দিবসের ইতিহাস, প্যারী কমিউন প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর পীযূষদার আলোচনা ছিল এক কথায় অসাধারণ। প্যারী কমিউনের শতবর্ষে পীযূষদা যেভাবে প্যারী কমিউনকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন তা অনবদ্য। আজও সেই সব কথা স্মরণ করে প্রেরণা লাভ করি। লেনিন শতবর্ষে রঞ্জি স্টেডিয়ামে 'নকল সংসদে' পীযূষদার বক্তব্য ছিল অভুতপূর্ব আজও আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করি।

পীযূষদার প্রাণখোলা হাসিও আমাকে আকর্ষণ করত। এমন দিলখোলা হাসি সচরাচর দেখাই যায় না বিশেষ করে মার্কসীয় ব্যক্তিত্বদের। যে মানুষ এমন প্রাণ খুলে হাসতে পারেন তাঁর মনতো আকাশের মত উদার বাতাসের মত নির্মল হবেই।

পীযূষদার চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল প্রবল। যা সঠিক মনে করতেন তার থেকে কোন কারণেই পিছিয়ে আসতেন না। এক সময়ে পার্টি নেতৃত্বের সাথে পীযূষদার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, আমাদের সাথেও পীযূষদার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে খুবই মনকষ্টে ছিলাম কিন্তু পীযূষদা কোনদিন তাকে সমর্থনের কথা বলেননি। আমি মনে করি এটাও পীযূষদার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মার্কসবাদের উপর অবিচল আস্থার লক্ষণ। পরে পার্টির সাথে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যায়। কিন্তু বয়সের এবং অসুস্থতার জন্য আর নতুন করে শুরু করা সম্ভব হয়নি। বাঙ্গালোর চলে যাবার আগে আমার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। বলেছিলেন ফিরে এসে দেশহিতৈষী পত্রিকায় লেখার চেষ্টা করবেন। বাঙ্গালোর চলে যাবার আগে সেটাই আমার পীযূষদার সাথে শেষ দেখা এবং শেষ আলোচনা। আমার ব্যক্তিগত আফশোষ যে অনুজের মত তাঁর শেষ যাত্রায় থাকতে পারিনি। এই খেদ আমৃত্যু থেকেই যাবে।

পীযূষদার পরিবারের সকলের সাথেই আমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বিশেষ করে বৌদি ও দুই ছেলের সাথে।

পীযূষদার প্রয়াণকে অবশ্যই অকালপ্রয়াণ বলা যাবে না, তবে যখনই চিন্তা করি যে সেই মানুষটি আর নেই — যাঁর কাছে গিয়ে পৃথিবীর যে কোন জটিল প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়াতে পারতুম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে আসতুম, সেই মানুষটি আর নেই ভাবতেই মনটা হু হু করে ওঠে। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষেকে একদিন চলে যেতে হয়, তাই আমাদের পরমপ্রিয় এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীযূষদাকে চলে যেতে হয়েছে কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার মত অসংখ্য বাগবাজার অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে জীবিতকাল পর্যন্ত চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। মার্কসবাদ বিজ্ঞান এবং সেই চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা বিজ্ঞানী, পীযূষদাও বিজ্ঞানী, পীযূষদা মৃত্যুহীন, পীযূষদা অমর রহে —

১৮ই ডিসেম্বর, ২০০২।

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত স্মরণে

অধ্যাপক ডঃ নিখিল চন্দ্র মজুমদার
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)

মানুষ স্মরণীয় হয় তার কর্মে ,আদর্শে ও চারিত্রিক ঐশ্বর্য্যে। এরকম একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের সবার পরিচিত অধ্যাপক পীযূষ কান্তি দাশগুপ্ত মহাশয়। কৃতী অধ্যাপক দাশগুপ্ত মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে সেদিনই যেদিন আমি উক্ত কলেজে গণিতের অধ্যাপক হয়ে প্রথম যোগদান করি। অবশ্যই তার অনেক আগে থেকে ওঁর নাম আমার পরিচিত অনেকের নিকট শুনেছি, যারা ওঁর ছাত্র ছিলো। অধ্যাপক হিসাবে প্রথম সারিতেই স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি। এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে ছাত্র ও অভিভাবক মহলে মুখে মুখে ঘুরত তাঁর নাম। তাঁর পান্ডিত্য ও শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলো।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল আগেকার ঘটনা। অনেক কিছুই স্মরণে আসছেনা। তবুও তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার আজও আমার চোখে ভাসছে। আমার সৌভাগ্য যে আমার কলেজে যোগদানের প্রথম দিনেই অধ্যাপক দাশগুপ্তর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। আমি শিক্ষক কক্ষে আপন মনে বসে আছি। এই মুহূর্তে শুধু আমি আর উনিই শিক্ষককক্ষে ছিলাম — অন্যান্য শিক্ষকেরা তখন ক্লাস নিতে চলে গিয়েছেন। উনি স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে আমার পরিচয় জেনে নিয়ে আমাকে বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমাদের পরিবারভুক্ত হলে — কোন অসুবিধা হলে বলবে।' এই কথা শেষ করে সহাস্য মুখে আমার পিঠে-হাত-রেখে ক্লাস নিতে চলে গেলেন। সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশ আমার কাছে। কিন্তু প্রথম দিনেই উনি আমাকে ওঁর আপন করে নিলেন স্নেহশীল দাদার মতো। সত্যই আমি অভিভূত হয়েছিলাম সেই মুহূর্তে। ওঁর কথাই ওঁর জাতকে আমায় চিনিয়ে দিল। মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা সবার থাকে না। তার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন। সেই প্রতিভারই অধিকারী ছিলেন তিনি।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে আর একটু টুকরো উপভোগ্য স্মৃতির কথা। অধ্যাপক দাশগুপ্ত যে আবার রসালাপী ব্যক্তি ছিলেন এ ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। যদিও উনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আমি ওঁকে, পীযূষদা বলেই সম্বোধন করতাম। তবুও কথাবার্তায় এবং আলাপচারিতায় আমাদের মধ্যে হাসিঠাট্টাও চলত। আমি একদিন ওঁকে একান্তে পেয়ে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে বললাম — পীযূষদা, বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা — একথা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলতে পারেন, তাই না' প্রত্যুত্তরে উনি বললেন, 'ঠিকই বলেছ ! কিন্তু ব্যাপারটা কী সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ ? ওঁর কথা শুনে আমি একটু থতমত খেয়ে নিরুত্তর রইলাম। কিছুক্ষণ আমার মুখের

দিকে তাকিয়ে থেকে পরে বললেন, ‘ তাহলে শোনোঃ নাগরদোলায় কখনও চেপেছ? — বললাম, হ্যাঁ, ‘চড়াকালীন কেমন অনুভূতি হোতো ? — বলেই কৌতুক হাস্যে প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন উনি। কী অসাধারণ সুন্দর উপমা ! উত্তর শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম আমি সেদিন ওই মুহূর্তে। I was completely overwhelmed by the stupendors response আজও তার নাগরদোলার কথা গুন গুন করে চিত্তে আমার বাজে।

অতি স্বল্পদিনই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। তার পর আমিও এ কলেজ ছেড়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে যোগদান করে এবং অন্যান্য পারিবারিক কারণে আর কোনদিনও তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ওই স্বল্পকালীন সময় তাঁকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মাধ্যমে যেটুকু বুঝেছি আলোচ্য নিবন্ধে তাই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

প্রদীপ জ্বালাতে হলে যেমন কিছু অপরিহার্য্য উপকরণ প্রয়োজন, সেরকম মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে হলে চরিত্রের কিছু গুণাবলী থাকাও একান্ত প্রয়োজন। এই বিশেষ কিছু গুণাবলীই অধ্যাপক দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। What impressed me overly was his amazing simplicity and honesty in thought and action. - চরিত্রের এই তেজেই উজ্জ্বল ছিলেন তিনি। সত্য কথা বলার সৎসাহস সবার থাকে না। মাথা উঁচু করে সত্য কথা বলতে কখনও পিছপা হতেন না যত প্রতিকূল পরিস্থিতিই হোক না কেন। নিজের আর্দশের প্রতি ছিল অবিচল আস্থা। কোন কিছুর জন্যই তা থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। অন্যদিকে আবার ঐ ব্যক্তিই ছিলেন শিশুর মত সরলপ্রাণ এবং একটু বেশী মাত্রায় আবেগ প্রবণ।

মাত্র কিছুদিন আগে তাঁর সহোদর ভ্রাতা অধ্যাপক শঙ্কর দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট জানতে পারলাম যে তিনি আর ইহলোকে নেই — প্রবাসে দেহ রেখেছেন। খবর জেনে খুবই মর্মাহত হয়েছি। মৃত্যুই সবার শেষ গতি। গীতায় বলেছে — ‘জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু’ঃ — ‘জন্মিলে মরিতে হইবে।’ কিন্তু এ সংসারে কিছু কিছু লোক থাকে যারা মরণের পরেও লোকের স্মরণে থেকে যায় তাঁদের কর্মে ও আদর্শে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত ছিলেন এরকমই একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্মরণে ‘স্মরণিকা’ প্রকাশেই তা যথার্থরূপে প্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথের কথায় — ‘মরণ তোমায় হরণ করেনি আজো।’ সেদিনের সেই নাগরদোলার কথা আজও আমার মনে দোলা দেয়।

পীযূষদা সম্পর্কে কিছু কথা

ইরা মিত্র (বঙ্গবাসী কলেজ)

যত দূর মনে পড়ছে গত মে মাসে কোন একটা ছুটির দিনে দুপুরে আমার বাড়ির ফোন বেজে ওঠে এবং ওপার থেকে এক নারী কণ্ঠ ভেষে এল। ইরা, আমি বৌদি বলছি, গলার স্বর শুনেই বুঝলাম পীযূষদার স্ত্রী স্বস্তি বৌদি, ওরা ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় এসেছেন এবং দেখা করতে বলছেন। এই স্নেহের ডাক উপেক্ষা করতে পারলাম না, এর কিছু দিন আগে আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় এবং প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স এর সহায়তা ' সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সাত দশক। সুধী প্রধান স্মারক রচনা সম্ভার ' প্রকাশিত হয়, এর একটা কপি পীযূষদাকে পৌঁছে দেবার তাগিদও অনুভব করছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি হিন্দুস্থান পার্কে পৌঁছলেও আমার বইটি পৌঁছায় নি। পথে আমার বোনের সঙ্গে হাত বদল হয়ে গিয়েছিল।

পীযুষদার বড় ছেলে সোহম ও নুপুর দাশগুপ্তের ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখলাম পীযূষদা ড্রইং রুমে বসে আছেন এবং স্বভাবসিদ্ধ অবস্থায় কিছু পড়ছেন. এবার তাঁর চেহারাটা এত খারাপ হয়েছিল যে তাঁকে দেখে আমি প্রথমে চমকে গিয়েছিলাম। অনেক ক্ষণ ছিলাম। অনেক আলোচনা হল। কিছুদিন আগে একটি স্থানীয় পত্রিকায় অবিভক্ত বাংলায় দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে কিভাবে স্থানীয় ভাবে কাঁচা পাটের বাজার গড়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনে তা কতটা সহায়ক হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছি বলে জানালাম। উনি বললেন এটি অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়, অনুবাদ করে E.P.W. তে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। চলে এলাম, তখনও ভাবিনি এটাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে।

আক্ষরিক অর্থে পীযূষদা আমার শিক্ষক নন। আমার মামারা ও মামীরা মনীন্দ্র কলেজে পড়েছে। উনি তাদের শিক্ষক। তাদের মুখে বহুবার শুনেছি পীযূষ দাশগুপ্ত একজন জাত শিক্ষক, এই ভাবে শৈশব থেকেই আমার মনে তাঁর একটা ছবি আঁকা ছিল। আমি তখন শ্রীরামপুর গার্লস কলেজে পড়াই এবং প্রফেসর - **বিনয় ভূষণ** চৌধুরীর কাছে গবেষণা করি। এই সময় পীযুধ দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঐ রাশভারী অথচ নিরঅহঙ্কারী মানুষটিকে দাদা বলে সম্বোধন করতে শুরু করি। এর কৃতিত্ব অবশ্যই আমার স্বভাব সিদ্ধ সরলতার নয়। আমার গবেষণায় বিষয়টির। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ — এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময়ে বাংলায় গড়ে ওঠা গণ আন্দোলনের চরিত্র নির্ণয় — আমার গবেষনার বিষয়টি পীযূষদাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছিল।

পীযূষদার প্রগাঢ় পান্ডিত্ব থাকা সত্বেও আমার গবেষনার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে তাঁর সর্বত্র স্বচ্ছন্দ গতি ছিল না। তিনি তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেন : এই কারণে উভয়ের মধ্যে আলোচনার যথেষ্ঠ সুযোগ সৃষ্টি হয়। মূল আলোচনায় যাবার আগে বলে রাখা ভাল যে আমার সঙ্গে তাঁর যখন

পরিচয় হয় তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কিছুটা নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিকে তাঁর সঙ্গে আমার সাজুয্য থাকায় অনেক সময় তিনি স্মৃতি রোমন্থন করতেন। এ ব্যাপারে বৌদিও তাঁকে অনেক সময় সাহায্য করতেন। এতদ্ সত্ত্বেও তাঁর মত বড় মাপের মানুষের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। এর জন্য অনেক বিদগ্ধ মানুষ আছেন, সুতরাং তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে আমার গবেষনার বিষয়ে কত ধরনের আলোচনা হত এবং আমার গবেষনা পত্রটি যাতে অত্যন্ত উচ্চ মানের হয় তার জন্য তিনি আমাকে কতভাবে সাহায্য করেছিনেন সেই সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে আমার বর্তমান প্রবন্ধটি সীমাবদ্ধ থাকবে।

গবেষনা বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই বলতে হয় যে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে খুব সচ্ছন্দ গতিতে আলোচনা এগিয়েছিল তা হচ্ছে সংঘঠিত শ্রমিক বিষয়ক। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন গুলির উত্তরণের, অর্থাৎ শ্রেণী সচেতন হওয়ার যথাযথ ব্যাপারে মাপকাঠি নির্ণয় করতে তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন। শ্রমিক সংগঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর গভীর প্রজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও যে সমস্ত সময় সাংগঠনিক কাজকর্ম দুর্বল হয়েছে তার প্রচলিত কারণ গুলির বাইরে নতুন কোন কারণ জানতে পেরেছি কিনা তা বার বার জিজ্ঞাসা করতেন। এ ব্যাপারে আমার সুপার ভাইজার শ্রদ্ধেয় বিনয় ভূষন চৌধুরীর মধ্যে তাঁর বড়ই মিল ছিল। শুরুতেই তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন পুরনো কথা পনরাবৃত্তি করার জন্য তোমাকে ডাকা হয় নি। নতুন কথা বলার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ১৯১৮ থেকে ১৯২২, অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকে এবং আন্দোলনের শেষ পর্যন্ত। বাংলা সহ ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের প্রবল ঢেউ এসেছিল। এবং এই সময় থেকে স্থায়ী ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠার সুত্রপাত হয়। এর অব্যবহিত পরেই অবস্থান্তর ঘটে। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ধর্মঘটের সংখ্যাও কমে যায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, বাংলায় যা তখন প্রায় একক ভাবে স্বরাজ্য দলের দখলে ছিল, শ্লথ গতি হয়ে যায়। এর জন্য প্রচলিত কারণ সমূহের অতিরিক্ত যে কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি তা হচ্ছে ১৯২৩ সালে যে Calcutta Municipal Act. পাশ হয়েছিল তাতে তিন বছরের জন্য মুসলিমদের জন্য ১৫ টি সংরক্ষিত আসন রাখার ব্যবস্থা হয়। এতেই স্বরাজ্য দলে ভাঙ্গন ধরে। তাঁর গল্ফ গ্রীনের ফ্ল্যাটের ড্রইং রুমে বসে একান্ত আলাপ চারিতার সময় এই তথ্যটি যখন বলি পীযুষদা খুশী হয়ে বলেছিলেন এটা তাঁর জানা ছিল না।

শ্রমিক সংক্রান্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি চটকলের সংগঠনকে ঘিরে এবং এটা সীমিত সময়ের জন্য নয়। সামগ্রিক ভাবেই বলা যায়। ১৯১৪ থেকে ১৯২৩ এই সময়কালের মধ্যে বাংলার তৎকালের সর্ব বৃহৎ শিল্প চটকলে অস্বাভাবিক পরিমানে উৎপাদন হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টা বাদ দিলে ১৯২৩ সালের পর বাংলার পাটকলের উৎপাদন পড়ে গিয়েছিল। এর প্রধান কারণ ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বহু পাটকল স্থাপিত হয় এবং

ভারত থেকে কাঁচা পাটের রপ্তানী যথারীতি অনেক পরিমানে বেড়ে যায়। এই পরিবর্তনের প্রভাব খুব স্বাভাবিক ভাবে পাট উৎপাদন কারী চাষীদের উপর গিয়ে পড়ে।

আলোচনা এই ভাবে এগোনোতো পীযূষদা আমাকে একজন পরিশ্রমী গবেষক বলে স্বীকার করেন এবং স্যার কে দেখানোর আগে তাঁকে ড্রাফটা দেখানো আমার পক্ষে সহজ হয়। নানা রকম ভুল ভ্রান্তির জন্য তিরস্কারও খুব কম সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু অবজ্ঞা করেন নি। সব প্রকৃত শিক্ষকের এই গুনটি থাকে।

বিগত শতাব্দীর বিশের দশকের শুরু থেকেই প্রথমে এক কক্ষ এবং পরে দুকক্ষ বিশিষ্ঠ বাংলার ও আইন সভায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ কারীদের বিশেষ স্থান করে দেওয়া হয়। প্রাদেশিক আইন সভায় তাদের প্রতিনিধিদের এই বিশেষ অবস্থানের জন্য এখানে গণ আন্দোলন কতটা গবেষনা পত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই বিষয়টা, বিশেষ করে অর্থনীতি ঘেঁষা বিষয় হওয়ার জন্যে, খুব পরিচিত রাস্তায় হাঁটা সম্ভব ছিল না, এখানে পীযূষদা আমাকে সরাসরি সাহায্য না করতে পারলেও অন্যভাবে সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করে দেন, তাঁর বিশেষ অনুরোধে তাঁর ভাতৃপ্রতিম এবং বিদ্যাসাগর কলেজের বিশিষ্ট অর্থনীতির অধ্যাপক নির্মাল্য চৌধুরী আমাকে সাহায্য করেন। তিনি পীযূষদার আগেই প্রয়াত হয়েছেন। প্রভাসদা (প্রভাস চন্দ্র সিংহ) এখনও বেঁচে আছেন। পীযূষদার আনুকূল্যে ইংরাজী সাহিত্যে সুপন্ডিত এই মানুষটির সান্নিধ্যে আসি এবং থিসিসের ভাষা সংক্রান্ত ভুল ভ্রান্তি দুর করতে তিনি আমাকে সাহায্য করেন।

এঁরা প্রত্যেকেই বড় মাপের মানুষ। তাই অকৃপন ভাবে প্রত্যেকেই তাঁদের সাহায্যের হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পড়াশুনার সুবাদে পীযূষদার কাছে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কতটা স্নেহ ভাজন হই সেই সম্পর্কিত দুই একটি কথা বলে প্রবন্ধটি শেষ করি। বৌদি খুব ভাল সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার বানান। ঐ খাবার খাওয়ার জন্য প্রায়ই ডাক পড়ত। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে আমি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই এবং আমাদের প্রতিবেশী বাদল ঘোষ রায় আমাকে পি.জি. হাসপাতালে নিয়ে যান পরে ওখানে ভর্ত্তী হতে হয়। এর পর আমাকে পেস্ মেকার বসাতে হয়। ফিরে এসে আমার প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছি বৌদি আমার খোঁজ পাবার জন্য পাগলের মত ছোটাছুটি করেছিলেন।

পীযূষদারা মরেন না, আমাদের মত গুনমুগ্ধ ভক্তদের মনের মণিকোঠায় চিরদিন বেঁচে থাকেন।

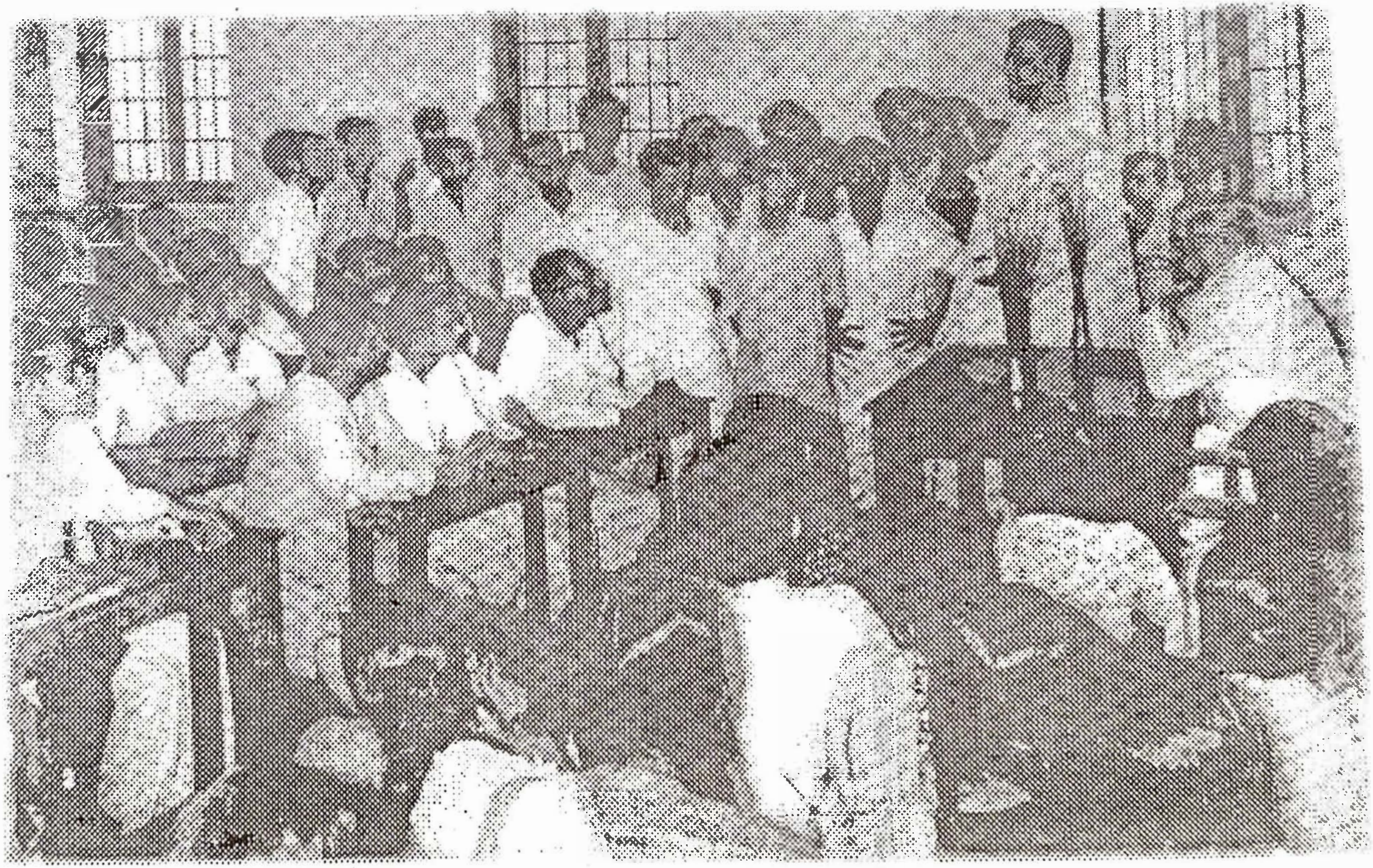
অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তকে আমি যেমন দেখেছি

— নির্মল কুমার সমাজপতি
সহ-সভাপতি, মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ, প্রাক্তনী।

১৯৫৯ সালে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের গরমের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। কলেজ খোলার পর বাৎসরিক পরীক্ষা শুরু হবার কথা। তার জন্য প্রতিঃ, দিবা ও নৈশ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুত হচ্ছে। এই সময় একদিন দুপুরে মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের নৈশ বিভাগের নব নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়নের চারজন সদস্য আমরা বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। অমি তখন মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের নৈশ বিভাগের ছাত্র ইউনিয়নের নব নির্বাচিত সম্পাদক। আমি তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে তাদের কাছে জানতে চাইলাম তাঁরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার কাছে এসেছেন ? তাঁরা আমাকে জানালেন যে মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত মহাশয়কে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেবার চক্রান্ত চালাচ্ছে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ। সুতরাং এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। এ কথা শুনে আমি তখনই আমার ইউনিয়নের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে পীযুষবাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এই প্রসঙ্গে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলে নেই। ১৯৪৫ সাল থেকেই আমি বাম ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ১৯৫০ সালে যখন আই. এস. সি পড়া শেষ করে শিক্ষকতায় যোগদান করি তখন থেকেই মূলতঃ শ্রমিক আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সব কটি রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাবভাবে জড়িত থাকার এবং নেতৃত্বে অংশিদার হবার সুযোগ পেয়ে ছিলাম। পরবর্ত্তীকালে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত রেলে চাকরী করি এবং পরবর্ত্তী কালে রাজনৈতিক কারণে চাকরী থেকে বিতাড়িত হই। সুতরাং চাকরী থেকে বিতাড়িত হবার কি জ্বালা তা' আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। ১৯৫৮ সালে পুনরায় স্কুল শিক্ষকতায় যোগদান করে আবার রাজনীতির সম্মুখ সারিতে চলে আসি। এই সময় মহারাজা মনীন্দ্র কলেজে নৈশ বিভাগে বি.এ ক্লাসে ভর্ত্তি হই। অতি সহজেই মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের নৈশ বিভাগের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই।

এক বিরাট নৈতিক দায়িত্ব যেন আমার কাঁধে চেপে বসল। পীযূষবাবুর বাড়ীতে পৌঁছে দিবা বিভাগের ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে দেখা হল। তাদের কাছ থেকে বিষদভাবে জানতে পারলাম কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের সামন্ততান্ত্রিক চক্রান্তের কথা — কলেজের জনপ্রিয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত মহাশয়কে কলেজ থেকে অপসারণ করার প্রচেষ্টার কথা। সব কিছু আলোচনার পর দিবা ও নৈশ বিভাগের দুটি ছাত্র ইউনিয়ন স্থির করলাম কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী মনোভাবের তীব্র বিরোধীতা আমরা যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে তুলব। তবে কলেজের প্রতিঃ বিভাগের ছাত্রী ইউনিয়নকেও আমাদের সঙ্গে চাই।

গরমের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং স্থির হল কলেজ খোলার প্রথম দিনেই আমরা



মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রিদের সাথে
উপাচার্য্য নির্মল সিদ্ধান্ত

প্রতিঃ বিভাগের ছাত্রীদের সামনে গেট মিটিং করে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দেব এবং কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিঃ বিভাগের ছাত্রী ইউনিয়নের নামে যে হ্যান্ডবিল ছাত্রীদের বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠিয়েছেন তারও তীব্র বিরোধীতা করে ছাত্রী ইউনিয়নের নেতৃদের আমাদের দিবা ও নৈশ বিভাগের ছাত্র ইউনিয়ন দুটির সঙ্গে বসতে আহ্বান জানাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রাতঃকালীন ছাত্রী ইউনিয়ন অবশ্যই আমাদের আবেদনে সাড়া দেবে।

গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হবার পরের দিন কলেজ খুলবে। আমাদের তাই দুই ইউনিয়নের নেতৃত্ব থেকে প্রাতঃবিভাগের ছাত্রীদের কাছে মাননীয় অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত মহাশয়কে মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ থেকে অপসারণের যে চক্রান্ত কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ করে চলেছে তা তুলে ধরতে হবে এবং এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের স্থিরকৃত কার্যসূচী অনুযায়ী দিবা ও নৈশ বিভাগের দুই ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্যরা প্রাতঃবিভাগের ছাত্রীদের সামনে কলেজ গেট মিটিং শুরু করলাম। আমি যখন প্রথম বক্তব্য রাখতে ছাত্রীদের সম্মুখে দাঁড়ালাম তখন কিছু কিছু ছাত্রীর মন্তব্য শুনেছি 'আরে খ্যাঙরা কাঠির উপর আলুর দম কি বলছে, শোন।' কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে আমি আমার বক্তব্য বলে চললাম এবং আহ্বান জানালাম যে কর্ত্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আসুন আমরা তিনটি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা মিলিত আন্দোলন আরম্ভ করি এবং আমরা তিনটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা আজই কলেজ প্রাঙ্গনে মিলিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের পরবর্ত্তী কর্মপন্থা স্থির করি।"

দেখলাম আমাদের আহ্বানে প্রাতঃবিভাগের ছাত্রী ইউনিয়ন সাড়া দিয়ে দিবা ও নৈশ বিভাগের ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে মাননীয় অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তকে পুনর্বহালের দাবিতে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন স্থির করলেন। বের হল যৌথ আন্দোলনের প্রচারপত্র। অধ্যাপকদের সঙ্গেও আমাদের এই পুনর্বহালের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হল। অধ্যাপকগণও জানালেন যে সর্বশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তকে চক্রান্ত করে বহিষ্কার করার বিরুদ্ধে তারাও আন্দোলনে সামিল হবেন। এর পরই শুরু হল ছাত্রছাত্রী আন্দোলন। অধ্যাপকগণও আন্দোলন শুরু করলেন অনশন দিয়ে। এই অধ্যাপকদের অনশন ধর্মঘটের সমর্থনে নৈশ বিভাগের সহ-সম্পাদক জ্যোতির্ময় নন্দী কলেজ গেটের সামনে অনশন শুরু কলেন। কলকাতায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন, এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নও সমর্থন জানালেন আমাদের আন্দোলনের প্রতি। কিছু কিছু ছাত্র দিয়ে মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের ছাত্র ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা ব্যার্থ করে দেওয়ায় আন্দোলন চলল ২৭ দিন ধরে। মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের তিনটি ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মাননীয় নির্মল স্বিদ্ধান্ত মহাশয়ের কাছে ডেপুটেশন দেয় এবং তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করে। তিনি ধৈর্য্য সহকারে ছাত্র ইউনিয়নগুলির সব কথা শুনে ছাত্র প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন ধর্মঘট আন্দোলন তুলে নিতে এবং আশ্বাস দেন যে এই বিষয়ের সম্মানজনক মিমাংশ তিনি করবেন। তিনি আরও অনুরোধ জানান যে অনশনরত অধ্যাপকগণ এবং কেজন ছাত্র প্রতিনিধি যেন অনশন ভঙ্গ করে। দীর্ঘ ২৭ দিনের আন্দোলন উপাচার্যের

অনুরোধে তুলে নেওয়া হয় এবং উপাচার্য মহাশয় নিজে উপস্থিত হলে অনশনরত অধ্যাপকদের ও এক ছাত্র প্রতিনিধিকে লেবুর রস খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করান। কলকাতার কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের এ এক বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য উদাহরণ।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে মাননীয় অধ্যাপক পীযূষবাবুর সঙ্গে আমার ভালভাবে পরিচয় হয়। দেখলাম নিজের নীতিতে বিশ্বাসী এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অধ্যাপককে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংগঠনের পুরভাগে থেকে নানাপ্রকার আন্দোলন পূর্বেও করেছেন এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে ভালভাবেই জড়িত ছিলেন। এরপর অধ্যাপক পীযূষবাবুকে দারিদ্র্যের সঙ্গে তীব্র লড়াই করতে হয়। তিনি আপার সর্কুলার রোডের উপর এক কোচিং খোলেন এবং সংগ্রামী ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের বিনা বেতনে পড়াবার ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর আমরা জানতে পারলাম যে অধ্যাপক পীযূষবাবু যাদবপুরে নেতাজীনগর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ্যের পদে নিযুক্ত হন। এই সংবাদ শুনে মনে বেশ আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। যোগ্য লোকের এতদিন পরে যোগ্য স্থানে নির্বাচিত হওয়ায় আমরা প্রাক্তন সব ছাত্ররাই খুব খুশী হই। পরবর্ত্তীকালে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টীর নেতৃত্বের এক উল্লেখ যোগ্য নেতা হিসাবেই তিনি পরিচিত হন। কিন্তু আরও কিছুদিন পরে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট উচ্চত্তম নেতৃত্বের সঙ্গে নীতিগত ও সাংগঠনিক কারণে মতদ্বৈধতা দেখা দেয় এবং অধ্যাক্ষ পীযূষবাবুকে পার্টী থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু তাই নয়, পার্টীর মধ্যে এই মতদ্বৈধতার জন্য অনতিবিলম্বে অধ্যক্ষ পদ থেকে অনৈতিকভাবে তাঁকে অপসারিত করা হয়। পার্টীর আমলাতন্ত্র তখন দৃঢ়নীতিবাদী পীযূষবাবুকে শুধু হাতে নয়, ভাতে মারারও চেষ্টা করে। এই ঘটনার পর একদিন তাঁর সঙ্গে আমার কর্মব্যাপদেশে রাইটার্স বিল্ডিংস -এ দেখা হয়। সেদিন তাঁকে বলেছিলাম, "স্যার, দেখলেন ত' পার্টীর আমলাতান্ত্রিক চরিত্রের কি নিষ্ঠুর রূপ"। উনি সে দিন শুধু একটু হেসে ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য করেন নি। এমনিই ছিলেন তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষ। সারা জীবনটাই তাঁর দারিদ্র্য এবং লড়াইয়ের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে। আর এই সততার জন্যই তাঁর কথা চিন্তা করলে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে আসে। খুব দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেই তিনি কার্ল মার্ক্স এর "ক্যাপিট্যাল" ৬টি খন্ডে প্রথম বঙ্গানুবাদ করে মার্কসবাদীদের কাছে অমর হয়ে থাকবেন।

মাঝখানের মানুষ

দিলীপ মজুমদার

তেরোই আগস্ট নেতাজিনগর কলেজে গিয়েছিলাম অধ্যাপক বিশ্বজিৎ গুহকে খুঁজতে। কলেজ বন্ধ। কেন? কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মারা গিয়েছেন-বলল একজন ছাত্র। প্রথম অধ্যক্ষ তো পীযূষ দাশগুপ্ত। হ্যাঁ পীযূষদা মারা গিয়েছেন, বাঙ্গালোরে। শেষের দিকে গলফ গ্রিনের বাড়ি বিক্রি করে বাঙ্গালোরে চলে গিয়েছিলেন বৌদি আর তিনি। তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না।

হয়তো যোগাযোগ না থেকে ভালোই হয়েছে। জীর্ণ, অসুস্থ পীযূষদাকে দেখে ভালো লাগত না, সইতে পারতাম না। গত শতকের সাতের দশকের শুরুতে পীযূষদাকে প্রথম দেখি। লম্বা, ফর্সা, ইসপাতের মতো ছিপছিপে অধ্যাপক মানুষটি উত্তর কলকাতার বাগবাজারের এক ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা। সম্ভবত কমিউনিস্ট কর্মী অসিত নন্দী আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি চিনতাম আগে থেকেই। অনেক পার্টি ক্লাস করে ফেলেছি ততদিন। সবচেয়ে ভালো লাগত পীযূষ দাশগুপ্তের ক্লাস। ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যালোচনা। মন্ত্রমুগ্ধ সব বয়সের, সব বৃত্তির শ্রোতা। বলবার আগে শ্রোতাদের গ্রহণক্ষমতার বিচার করে নিতেন তিনি। সেই সঙ্গে ছিল রসসঞ্চারের ক্ষমতা। ছিল সামঞ্জস্য আর পরিমিতিবোধ। বারাসতে ছাত্র-যুবদের পার্টি ক্লাসে তাঁর একটি চমৎকার রসিকতা এখনও স্মৃতিতে সজীব। বলছিলেন নীল বিদ্রোহের কথা। বলতে বলতে বললেন, 'ইংরেজদের নীলের প্রতি বড় অনুরাগ। হবে না, ওদের মেয়েরাও যে নীলনয়না!'

বিদগ্ধ পন্ডিত তিনি ছিলেন না, কিন্তু অধীত বিদ্যাকে অলঙ্কার না করে জারিত করেছিলেন হৃদয়ে এবং যথাযত প্রয়োগ করেছিলেন জীবনে। এর চেয়ে বিদ্যার বড় সার্থকতা আর নেই। মার্কসবাদী তিনি আজীবন, কিন্তু কখনও যান্ত্রিক নন। প্রায়ই একটা কথা বলতেন, 'মার্কসবাদ তো মানবতার নির্যাস।' তাই সাধারণ ছাত্র, সাধারণ কর্মচারী সকলের সঙ্গে তাঁর সমান ব্যবহার, সকলের জন্য সমান মমতা।

মার্কসবাদী সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবে বিপুল তাঁর খ্যাতি। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির বেশ কয়েকটি বইয়ের অনুবাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নবজাতক প্রকাশনের স্তালিন রচনাবলীর প্রধান সম্পাদক তিনি। বাণীপ্রকাশের 'ক্যাপিটাল' পূর্ণাঙ্গভাবে অনুবাদ তিনিই করেছেন। পি সুন্দরায়া, বি টি রণদিভে, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ পশ্চিমবাংলায় কোন সভায় বক্তৃতা দিলে ডাক পড়ত পীযূষদার। ওঁরা ইংরেজিতে বলতেন, তার বাংলা করে দিতেন পীযূষদা। শেষ দিকে কিছু মৌলিক লেখাতেও হাত দিয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'প্রথম আলো' উপন্যাসে পীযূষদার রবীন্দ্রনাথের একটি বইয়ের উল্লেখ করেছেন।

পড়া-পড়ানো-লেখার জগৎটাই ছিল তাঁর নিজস্ব। কিন্তু সে জগৎ ছেড়ে যখন তিনি রাজনৈতিক সংগঠনে মন দিলেন, তখনই মস্ত ভুল করে বসলেন। স্বধর্মে নিধন ভালো, কিন্তু পরধর্ম সবসময়েই ভয়াবহ। এর জন্য তাঁর কিছু শুভার্থীও দায়ী। নেতাজিনগরের যে বাড়িতে থাকতেন তখন, সেখানে একদিন কথা প্রসঙ্গে ওই পরধর্মের প্রসঙ্গ তোলায় তাঁর সামনে তাঁর একজন শুভার্থী আমাকে তিরস্কার করলেন। পীযূষদা বললেন, 'জানো, দূরদূরান্ত থেকে কমরেডরা আসছেন, যোগাযোগ করছেন।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রমোদ দাশগুপ্ত যথাস্থানে থাকলেন, জ্যোতি বসু বৃত্তচ্যুত হলেন না, পীযূষদাই হলেন, 'ঘরেও নহে পরেও নহে যে জন রহে মাঝখানে।' এই রাজনৈতিক আবর্ত বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটাল। প্রশান্ত শূর এবং পীযূষদা বিচ্ছিন্ন হলেন। বেশ কয়েক বছর পরে অবশ্য দুই বন্ধুর মিলন দেখেছিলাম এবং যথারীতি আনন্দাশ্রু সংবরণ করা যায়নি।

পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্তটা, অতএব ভুল এবং সে ভুলের মাশুল পীযূষদাকে দিতে হয়েছে। এরকম ভুল আমরা সবাই কোনও না কোনওভাবে করে ফেলি। ক্ষুদ্রমনা মানুষরা এরকম ভুল একজন ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় বলে মনে করে এবং 'যারে দেখতে নারি তারা চরণ বাঁকা' প্রবাদানুযায়ী তাঁকে তুলোধোনা করে। মানুষ হিসেবে পীযূষদা সেইসব ক্ষুদ্রমনাদের অনেক, অনেক ওপরে। পাকেচক্রে দলে টেনে নেওয়া, নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা এবং তারপর রস নিংড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া এসব চাণক্যনীতিকে ঘৃণা করতেন তিনি।

একটা ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। তখন তিনি মেতে আছেন 'লেনিন সেন্টার' নিয়ে। রানিকুঠী থেকে ট্যাক্সি নিয়েছেন। আমি যাব কলেজ স্ট্রিট। আমাকেও তুলে নিয়েছেন। ধর্মতলায় নামিয়ে দিলেন আমাকে, একবারও বললেন না 'লেনিন সেন্টারে' যেতে। তাঁর সঙ্গে আমার যে কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক, তিনি ডাকলে, ইচ্ছে না থাকলেও আমাকে যেতে হত। পীযূষদা সে সুযোগ নেননি।

প্রতিটি মুহূর্তেই দাদাকে miss করি

শঙ্কর দাশগুপ্ত

গত ১২ই আগষ্ট সন্ধ্যায় দাদার অসুস্থতার খবর এবং দুঘন্টার মধ্যে দাদার প্রয়াণ — এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক নিদারুণ দুঃসংবাদে গোটা বাড়ীতে দুঃসহ বেদনার নিস্তব্ধতা নেমে এল। রাত ১১টা। পড়ার ঘরে এসে বসলাম। ডেস্ক-এর মধ্য থেকে আমাকে লেখা দাদার এক গুচ্ছ চিঠি বের করলাম। রাত ৩ টা পর্যন্ত প্রতিটি চিঠি একাধিক বার পড়লাম। আমার অনুভূতি, জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে দাদা আমাকে শুধু তার ভাই নয়, বন্ধু রূপেও পেতে চেয়েছিল। কয়েকটি চিঠিতে তার স্পষ্ট উচ্চারণ রয়েছে।

স্নেহের শংকর,

মাসাধিক কাল এখানে এসেছি। এসেই তোমাকে ও অন্যান্যদের চিঠি দিয়েছি। একমাত্র কানু ছাড়া কারো কাছ থেকে কোন উত্তর পাইনি। বাকিরা চিঠি পেয়েছে কিনা বুঝলাম না। যদি নাও পেয়ে থাকে, তবু খবরও তো নিতে পারে। অন্তত তুমি।

স্নেহের শংকর,

নিজে চিঠি না দিতে পারলেও প্রতিদিনই তোদের কাছ থেকে চিঠি পাবার আশা করতাম। তাই তোর চিঠি পেয়ে কী যে আনন্দ হয় তা বোঝাতে পারব না। কোন কারণে আমি যদি চিঠি নাও দিতে পারি তুই কিন্তু অবশ্যই নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাবি। কলকাতা, বিশেষ করে তোদের কাছ থেকে এত দূরে থাকায় তোদের চিঠি আমাদের 'বড় সম্পদ'।

স্নেহের শংকর,

দীর্ঘকাল পরে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য ক্ষেত্রে কত কিছু ঘটে গিয়েছে। এমনকি বর্ষপঞ্জীর ক্ষেত্রেও শতকান্তর ঘটে গিয়েছে। কতবার মনে করেছি তোমাকে ও প্রভাসদাকে কালকেই চিঠি লিখে এই সব ঘটনায় ও দুর্ঘটনায় আমার প্রতিক্রিয়া জানাব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অবসাদের কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি।

এখানে তোমাদের সবাইকে, বিশেষ করে তোকে খুব miss করি।

দাদার মৃত্যুর পর নয় মাস অতিক্রান্ত। আজও চিঠির কয়েকটি কথা সারাক্ষণ মনে বাজে, মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে "তবু খবরও তো নিতে পারে। অন্তত তুমি", "তোর চিঠি পেয়ে কী যে আনন্দ হয়", "কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অবসাদের কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি", "তোকে খুব miss করি"।

আজ আমার অনুশোচনার শেষ নেই: কেন দাদার শরীর ও মনের অবস্থার কথা জেনেও নিয়মিত ও ঘন ঘন চিঠি ওকে লিখলাম না। নিয়মিত চিঠি পেলে শারীরিক অসুস্থতার হয়ত কোন উপশম হত না। কিন্তু মানসিক অবসাদ অবশ্যই লাঘব হত।

দাদা আমাকে কত গভীরভাবে miss করত তা আমি বুঝতে পারিনি। আজ আমি দাদাকে প্রতি মুহূর্তে miss করছি।

নীতিগত প্রশ্নে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণের জন্য পার্টির সঙ্গে দাদার বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই নেতাজীনগর কলেজ থেকে দাদা পদচ্যুত হয়। তারপর শুরু হল নিজ গৃহে দাদার নির্বাসিত জীবন যাপন। এই দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দাদার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লেও ওর মানসিক শক্তি শুধু অটুটই ছিল না দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই অদম্য শক্তির জোরেই দাদার জীবনের শেষ অধ্যায় বিশেষ অর্থে আরও গুরুত্বপূর্ণ, আরও ফলপ্রসূ হয়ে বুদ্ধিজীবি মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। মার্কসের তিন খন্ড 'ক্যাপিটাল'-এর বাংলায় অনুবাদ করার মতো দুরূহ challenging প্রয়াস, শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ — মার্কস থেকে মাও-এর মতো গবেষণা-ধর্মী কাজ, 'অন্য চোখে রবীন্দ্রনাথ' -এর মতো মৌলিক রচনা ইত্যাদি এই অধ্যায়েরই ফসল। এছাড়া প্লেখানভ-। এক নবমূল্যায়ন (এখনও গ্রন্থরূপ পায়নি), বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধের কথা উল্লেখ্য।

মার্কসবাদ প্রচারে ও প্রসারে দাদা জীবনের শেষ অধ্যায়ে যা কিছু রেখে গেল তা আগামী দিনে যথার্থ সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পার্টি সদস্য থাকাকালীন এবং পার্টি থেকে বিচ্ছেদ ঘটার পর, পীযূষ দাশগুপ্তের কোন ভূমিকা ইতিহাসের বিচারে স্মরণীয় হবে। আমার মতে এই প্রশ্ন অবান্তর। কারণ আপাত বা বিশ্লেষণী, কোন দৃষ্টিতেই এই দুই ভূমিকার মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা, মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং পার্টির প্রতি মমত্ববোধ এই বিরোধকে মাথা তুলতে দেয়নি। এখানেই দাদার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য, অনন্যতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দাদার পাঠ্য বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। চর্চা ও

গবেষণার মধ্য দিয়ে দাদা এক্ষেত্রে তার জ্ঞানের পরিধি অনেক দূর বিস্তৃত করেছিল। এছাড়া দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বহুমাত্রিক জ্ঞান, অসাধারণ বিশ্লেষণী দক্ষতা এবং অপূর্ব উপস্থাপনা, এই ছিল ওর অন্যতম 'সেরা তত্ত্বগত শিক্ষক - সংগঠক হিসেবে পার্টিতে বিশেষ মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভের মূলমন্ত্র। পার্টির বৃত্তের বাইরেও দাদা বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। জীবনে অনেক নামী-দামী ব্যক্তিত্বের মূল্যবান আলোচনা শোনার সুযোগ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আলোচনা আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। আজও মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বৈঠকী আলোচনায় এঁদের কথা স্বাভাবিক কারণেই উঠে আসে। এঁরা হচ্ছেন প্রাক্তন বিচারপতি, মিঃ পি. বি মুখার্জী (বিষয় ঃ Legal sense of Shakespeare) অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী (বিষয় ঃ রবীন্দ্র দর্শন ও সাহিত্য), শ্রী জ্যোতিভূষন চাকী (বৌদ্ধ দর্শন বনাম রবীন্দ্র দর্শন), শ্রী দিলীপ বিশ্বাস (বিষয় : Bengal Renaissance - From Rammohan to Dr. Satyen Basu) এবং অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত (বিষয় ঃ মার্কসবাদ ঃ দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাস)। তবে অধ্যাপক মুখার্জী ও অধ্যাপক দাশগুপ্তর আলোচনাই আমাকে অনেক বেশি অভিভূত করেছিল। এই পাঁচটি অসাধারণ আলোচনা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। দাদাকে চিঠিতে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলাম।

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সম্পাদক ও দেশপ্রেমিক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেনের জন্মশত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে বর্ষব্যাপী যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তাতে ডঃ সেনের অতি প্রিয় ছাত্র, পীযূষ দাশগুপ্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা ছিল। ডঃ সেনের ভাইপো শ্রী জহর সেন দাদার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জহরবাবুর অনুরোধ, দাদা যেন ডঃ সেনের চারখানা বিখ্যাত গ্রন্থের কোন একটিকে কেন্দ্র করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রস্তাবিত স্মারক গ্রন্থে এই রচনা অন্তর্ভুক্ত হবে। মৃত্যুর আগের দিনও সকালে জহর সেন ১৫ - ২০ মিনিট বাঙ্গালোরে দাদার সঙ্গে কথা বলেছেন। দাদার শেষ কথা, 'জহর, আমি লেখাটা দিতে চেষ্টা করছি'। দাদা কথা রাখতে পারেননি।

'শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অবসাদ' এর মধ্যেও দাদা অলস অবসর জীবন কাটাতে চায়নি। দাদার খুব ইচ্ছা ছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা। দাদার এই ভাবনাকে আমি খুব appreciate করেছিলাম। আমি দাদাকে বলেছিলাম, লেখাটা যদি 'The Story of Philosophy -র মতো হয় তাহলে তোমার উদ্দেশ্য ষোল আনা পূরণ হবে। দুঃখের বিষয়, দাদা ও কাজে আর হাত দিতে পারে নি।

নেতাজীনগর কলেজ থেকে dismissal - এর বিরুদ্ধে দাদার case টা শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের Appellate Tribunal-এ যায়। ট্রাইবুনালের রায়ে দাদার case সম্পূর্ণ vindicated হয়। যেহেতু দাদা ইতিপূর্বেই ৬০ বছর (age of retirement) পেরিয়ে গেছে Tribunal তা note করে রায়ে দাদাকে date of dismissal থেকে date of retirement

অবধি দাদার সমস্ত claims মিটিয়ে দেবার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।

রায়ের কপি বোধ হয় মাস খানেক পরে দাদার হাতে পৌঁছায়। কপিটা নিয়ে দাদা আমার বাড়ীতে ঢুকেই আমার হাতে তা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়েন। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল দাদা যেন রায়ের সবটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি, তাই আমার প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়। রায়ের প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত যথেষ্ট সময় নিয়ে পাঠ করলাম। তারপর অত্যন্ত serious মুখে দাদাকে 'নির্দেশ' করলাম, 'একটু উঠে দাঁড়াও'। দাদা কিছুটা বিহ্বল, উঠে দাঁড়ালো। আমি নত হয়ে ওর দুপায়ের পাতা স্পর্শ করে প্রণাম করেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'তোমার একশত শতাংশ জয় হল। তুমি নবজন্ম লাভ করলে। আমরা এই মুহূর্তে এর চাইতে বড় কোন আনন্দদায়ক ঘটনার কথা ভাবতে পারি না। একে Celebrate করতেই হবে।' দাদাকে visibly relaxed দেখলাম।

আমার দীর্ঘ ৫০ বছরের সাবালক জীবনে দাদা আমার Philosopher and Guide। ওর জীবন-দর্শন, লক্ষ্য সাধনে অনুসৃত পথ, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আপোষহীন অবস্থান গ্রহণ ইত্যাদি সব কিছুই আমার জীবনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। আজ পর্যন্ত যতটা পথ হেটেছি, যতটা জেনেছি-বুঝেছি, যা কিছু লিখেছি তার পেছনে ছিল দাদার আন্তরিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও প্রেরণা।

দাদার স্মরণসভায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্বের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কমরেড অনিল বিশ্বাস ও কমরেড বিমান বসু উভয়েই দাদার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ্য কথা বললেন, 'ভুলবোঝা-বুঝির জন্যেই পার্টির সঙ্গে পীযূষদার বিচ্ছেদ ঘটেছিল। কিছুদিন আগেই এই ভুল বোঝা-বুঝির অবসান ঘটেছে।' আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল, 'হায় অন্ততঃ দশটা বছর আগে যদি এই ভুল ধরা পড়ত তাহলে দাদা ও পার্টি, দু পক্ষই লাভবান হত।' দাদা আরও কিছুদিন বেঁচে থেকে পার্টির বিকাশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু তা হল না। বেদনা ভারাক্রান্ত মনে বাড়ীতে ফিরে এলাম।

একটি সাচ্চা মানুষের স্মৃতি

বাসব দাশগুপ্ত

আমার প্রথম স্মৃতি। হয়তো বা উণপঞ্চাশ। দমদম জেলের গরাদের ওপারে দাদা। মার হাত ধরে আমি, আমার ছোটবোন বন্দী দাদাকে দেখতে গেছি। প্রায়ান্ধকার ওধারে আমার রূপবান দাদা। কয়েকদিন বাদে নীল লাইন টানা কাগজে জেল থেকে দাদার চিঠি। কবিতা। "দমদম জেলে আজ ঝমঝম বৃষ্টি, থমথমে প্রকৃতির একি অনাসৃষ্টি। বাসুমনি দ্বীপু মনি তোমরা কি করছো ? / মার কোনে শুয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছো ! / ঝিকি মিকি বেতবনে জোনাকির দেয়ালি / তোমাদের চোখে মুখে স্বপ্নের হেয়ালি।"

তারপর পঞ্চাশ না একান্ন ? ঠিক মনে নেই। "গভীর রাতে ঘুমিয়ে আছে পাড়া। হঠাৎ শুনি রাতের কড়া নাড়া।" জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দাদা বাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে সরোজ দত্ত আর অসিত সেন।

বাবা ছিলেন ভয়ানক জাতীয়বাদী। শুনেছি চারের দশকে জনযুদ্ধর শ্লোগানে বাবার সঙ্গে দাদার খুব তর্ক হতো। বাবা চমৎকার শৈলীর নিখুঁত ইংরেজির মনস্ক পাঠক / দাদা পি সি জোশীর লেখা পড়তে দিতেন। সেই বাবা চীন ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময় বলতেন ডাঙ্গে সেলফ্ স্টাইনড্ কমিউনিস্ট।

আমার মেজদা মৃনাল দাশগুপ্ত। ইতিহাসের অধ্যাপক। দাদার পায়ে পায়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে। খুব অল্প বয়সে মারা যায়। কালান্তক ব্যাধিতে হাঁসপাতালে। চলে যাওয়ার দুদিন আগে মার হাত ধরে প্রিন্স অব ওয়েলসের ২৯ নম্বর বেডের সামনে। কোমায় আচ্ছন্ন। কোন সহৃদয় বন্ধু বেডের পাশের টেবিলে রক্ত গোলাপের স্তবক রেখে গেছে। প্রায় অচেতন মৃনাল। তাঁর রাশিয়া যাবার কথা ছিলো। ঐ ফুল তার বিভ্রম জাগায় / সে নাকি রাশিয়াতে / টেনে টেনে শ্বাস নিয়ে মাকে প্রশ্ন করে — কেমন করে এলে ? আমিতো মস্কোতে ! মর্মাহত যুবকের সেই অস্ফুষ্ট হাসি আমি আজও ভুলতে পারি না। দাদা, মেজদা, কমিউনিস্ট পার্টি সেই শৈশব থেকে আমার মস্তিস্কের কোষে কোষে, রক্তবাহী ধমনীতে। আজ পারিপার্শ্বিকে মেলাতে গেলে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ টের পাই।

দাদা জেল থেকে ফিরে আমার পরে আমাদের বাড়িতে প্রায় রোজ আড্ডা হোত। অসিত সেন, সরোজ দত্ত নিয়মিত। দাদা আর সরোজদার উচ্চকিত হাসি ছিল বিখ্যাত। আসতেন ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেন, অধ্যাপক অমরেন্দ্র মিত্র, চরকাশেমের উপন্যাসিক অমরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মৃনাল সেন, সমরেশ বসু, ননী ভৌমিক প্রফুল্ল রায় চৌধুরী, অমলেন্দু দে। মাঝে মধ্যে ঋত্বিক ঘটক এবং

হতো, ওঁরা যখন স্ট্যালিনের নাম উচ্চারণ করছেন, তখন রাইফেলের বোল্ট টানার ধাতব ঝংকার। ডেভিড কোহেন। তখন রণদীভের তত্ত্ব বাতিল। উত্তেজিত বিস্ফোরক আলোচনা। আমার মনে

আমাদের বাড়ির ঠিকানা ছিল ৪নং কংগ্রেস একজিবিসান রোড। কাছে নিউপার্ক স্ট্রীটে স্বাধীনতা পত্রিকার অফিস। দাদার হাত ধরে যেতাম। মুদ্রণ যন্ত্রের শব্দ, সৌরভ। আর দেখতাম কাঁটি সব মানুষদের। ব্যক্তি জীবনের স্বপ্ন নয়, সমস্টির মুক্তি তাঁদের প্রাণিত করে। কিছু বুঝতাম না। তবু দাদা এবং তাঁর কমরেডদের মনে হতো লাল কমল আর নীল কমলের দল। এমন এক জীবন, যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য নেই। অথচ অভিযোগও নেই। কি যেন তারা পেয়ে গেছেন। কোন দুর্নিবর এক জীবনের বহতা স্রোতে তারা কেবলি এগোয় মোহনার দিকে।

স্তালিন মারা গেলেন। এক অসহ্য শোকের পাথর চাপা দিন রাত। পিতৃ-বিয়োগের থেকেও তীব্র কোন ব্যথায় দাদাকে অস্থির হতে দেখেছি। স্বাধীনতা অফিসের প্রাঙ্গনে ডকিউমেন্টারী দেখানো হলে। স্তালিন .... স্তালিন......... আমাদের স্বপ্নের নায়ক।

তখন পার্কসার্কাস ময়দানের পিছন দিকে পার্টির সভা হতো। দাদার সঙ্গে আমরা সবাই যেতাম। কৃশকায়স প্রশান্ত চোখের কাকাবাবুর ব্যতীক্রমহীন উপস্থিতি। কাকাবাবু, মুজফফর আহমদ দাদাকে পুত্র প্রতিম স্নেহ করতেন। বক্তৃতার আগে ও পরে গান নাটক। দেবব্রত বিশ্বাসের দিগন্ত-প্লাবী গান- "এ দেশে জন্মে পাদাঘাতই শুধু পেলাম।" সুচিত্রা মিত্রের গান শুনতাম "সার্থক জনম আমরা, জন্মেছি এই দেশে। সলীল চৌধুরীর গণসঙ্গীত। শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি। ম্যাকসিম গোর্কির মাদারের কয়েকটি অংক অভিনীত হতো। মমতাজ আহ্মেদ -এর অভিনয় " অরুনোদয়ের দেশে।" দাদার হাত ধরে ওয়েলিংটন সেকায়ারের নাট্য উৎসবে দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের "আচলায়তন" উৎপল দত্তের প্রযোজনায়।

কবিতা, গল্প, গান, রবীন্দ্রনাথকে ভালো বাসতে শেখানো — এ সবই আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে দাদার কাছে শেখা। এ জীবনে যদি কোথাও কোন উৎক্রান্তি আমার ঘটে থাকে, সে সবই দাদার দেওয়া। আমাদের পার্কসার্কাসের বাড়ির পেছনের উঠোনে একটা পুরোনো ইজি চেয়ারে বসে কোন কোন সন্ধ্যাবেলা দাদা আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

দাদার সঙ্গে দেখেছিলাম ফল্ অফ বার্লিন, হোয়াইট হেয়ার্ডগার্ল — ঐ দুটি চলচ্চিত্র।

বিংশতি পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি যখন মূল্যায়নের নামে স্তালিনের প্রায় সমস্ত অবদান অস্বীকার করলো, তখন দেখেছি দাদার যন্ত্রনাকাতর অস্তিত্ব। এতো তাঁদের কাছে আত্মখন্ডন। বিশ্বাসের অপহ্নব। পার্টির ভিতরে দুটো ভাগ হয়ে গেল। ক্রুশভের সমর্থক আর স্তালিনবাদী। দাদা শেষোক্ত গোষ্ঠিতে। যাটের দশকের গোড়ায় চীন ভারত যুদ্ধ। নেতারা অধিকাংশ

কারাগারে। পার্টির নির্দেশে দাদা আত্মগোপন করলেন। গোপন পার্টির কেন্দ্রে তখন সমর মুখোপাধ্যায়। দেশহিতৈষী পত্রিকা প্রকাশনায় দাদার ভূমিকা শ্রদ্ধেয় সরোজ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন। ন্যাসনাল বুক এজেন্সী যে তদানিন্তন সি পি আই নেতৃত্ব দখল নিতে পারেন নি, সেখানেও দাদার ভূমিকা।

পার্টি যখন অবিভক্ত, তখন ইয়েরেমিন প্রমুখ রুশী নেতা দাদাকে খুব পছন্দ করতেন। ওরা অনুরোধ করেছিলেন "চীন পন্থীদের" হাতে নয়, এন বি এ -যেন সি পি আই এর হাতে থাকে। এর জন্য দাদাকে রুশী দূতাবাসের পদস্থ কর্মী হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

দাদা তখন এসব উড়িয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী এবং দুই ছেলে — কেমন করে চলবে - এ সব চিন্তা মাথায় ঠাঁই দেননি। আত্মগোপনরত অবস্থায় দুবার দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি তখন পার্টি সদস্য। সেই সময় প্রবল আক্রমন। দাদা মোহিত মৈত্রর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। দেশহিতৈষীর জন্য লিখে চলেছেন। গোপন পার্টিতে দাদার নাম ছিলো তমাল।

পার্টি ভাগ হওয়ার পরে সি পি আই (এম) এর সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত কর্ম সূচী ব্যাখ্যার জন্য অজস্র ক্লাস নিতে হয়েছে তাঁকে। গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছে। অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছেন ডঃ বিনয় ভট্ট্যাচার্য্যের জন্য।

পার্টির সঙ্গে বিচ্ছেদের যে পর্ব, আমি সে প্রসঙ্গে যেতে চাই না। কেন কিসের জন্য, একজন মানুষের আজন্ম আস্থা আত্মত্যাগ সত্যেও এমন ঘটনা ঘটে ! আমি জানিনা। আমি শুধু প্রত্যক্ষ করেছি একজন মানুষের আমূল প্রোথিত প্রত্যয়ের এক নিদারুণ পরিণাম। তবু ভেবে বিস্মিত হই, এই নিরলম্ব নিসকরুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কেমন করে দাদা ক্যাপিটালের অনুবাদ সম্পন্ন করলেন ? কৃতজ্ঞতা হবে যদি অধ্যাপক প্রভাস সিন্হার নাম না করি। এমন বন্ধুত্ব বিরল ! পিছনে প্রজ্জ্বলন্ত সাঁকো। সামনে গভীর গিরিখাত। সেই সময় প্রভাসদা তাঁর নিসকম্প হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি বারবার পার্টির সঙ্গে সেতু তৈরী করতে চেয়েছি। এই অনির্ভর জগতে একা ব্যক্তি মানুষ কি নিয়ে বেঁচে থাকে। তার পায়ের তলার মাটি কেটে চৌচিড় হচ্ছে। তার ধরার মতো কোন অবলম্বন নেই। তাই কি হয় ! আমি উপলব্ধি করেছিলাম দাদার ভিতরে রক্তক্ষরণ। তাঁর নিঃসঙ্গ দৈনন্দিন বাস্তবতা। এই যে মানুষটি, চারের দশকের সূচনা থেকে "অ্যাট দি কল অব কমরেড লেনিন" তাঁর যাত্রার সূচনা করেছিলেন, সাতের দশকের মধ্যভাগে, তাঁকে পরিহার করে মিছিল এগিয়ে চলেছে, এই যন্ত্রনা কেমন করে সহ্য হবে ?

মাও সে তুং বলেছিলেন " Truth lies with the minority ", বারান্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি এক নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক, ছেঁড়া ছাতা নিয়ে পথ বেয়ে চলেছি সত্যের অণ্বেষনে। কিন্তু অণ্বেষন শেষে পৃথিবীকে বদলাবার অমোঘ বীজ মন্ত্রটি পেয়ে গেলে, মানুষকে আবার ফিরতে হয় প্রতিষ্ঠানের কাছে। সহমর্মীতার জন্য, সৌভ্রাতৃত্বের জন্য, নতুন স্টেশনে যে গাড়ি পাড়ি

দিচ্ছে, তার জন্য। " অন্ধকারে চোখে চোখে নির্ভরের মাধুরী ঘনায়।"

শেষবারের মতো চলে যাবার আগে দাদা জেনে গিয়েছেন, পার্টি নেতৃত্ব তাঁকে মুক্ত করেছেন স্বার্থ প্রণোদিত আরোপিত অভিযোগ থেকে। তাঁকে আবার বলা হয়েছিল কিছু দায়িত্ব নিতে। একটি তাপিত প্রাণ শান্তি পেয়েছিল হয়তো, কিন্তু দুর্মর অভিমান কি তাঁকে দরোজার প্রান্তে আমৃত্যু দাঁড় করিয়ে রাখলো ?

ভুলিনি

শমিতা চট্টোপাধ্যায়

খুব আশ্চর্য সহজ ভাবে আমি আমার জ্যেঠুর কথা বলতে পারি। এমন ভাবে কথা গুলো এসে হাজির হচ্ছে, যেন কালই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল, আর তারই সুতো ধরে কথা বোনা ! অবাক লাগে ভাবতে, যা আমার কাছে এত স্বাভাবিক, বাস্তব, তা আমার অনুভূতির তোয়াক্কা না রেখে বাস্তবাতীত !

ছোটবেলা থেকেই জানি, আমার জ্যেঠু খুব মানী লোক — লোকে তাঁকে সম্মান করে, ভালোবাসে, তাঁকে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। জ্যেঠুকে ঘিরে অনেক গল্প। জ্যেঠু মানে 'বিপ্লব', জ্যেঠু মানে চাদরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা গরম বন্দুক, জ্যেঠু মানে সমাজ-বদল .... ফলে আমার ছোটো বয়স থেকেই জ্যেঠু আমার কাছে একটা concept । আমার মুখচোরা স্বভাব নিয়ে যে concept -এর কাছে জমা রেখেছিলাম লাল টুপি, স্যালুট এবং নমস্কার।

জ্যেঠুর সঙ্গে আমার স্মরণীয় মোলাকাৎ এমন একটা সময়ে যখন জ্যেঠু জানতে পেরেছেন, আমি ভিন্ন রাজনৈতিক পন্থার প্রতি বিশ্বাসী। আলোচনার জন্য কি উদার আহ্বান পেয়েছিলাম তাঁর কাছে ! তখন বুঝেছিলাম বহু জায়গায় অ-বুঝিত বা ভুল-বুঝিত এ মানুষটি সত্যিকারের মার্কসবাদী অর্থে contradiction -এর মোকাবিলা করেন।

জ্যেঠুর একান্ত ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণ মেদহীন — বিলাস বহুলতা থেকে বহু দূরে এক নিজস্ব জগতে পদচারনায় তিনি স্বচ্ছন্দ। সে জগতে বই আছে, পুঁথি-সর্বস্বতা নেই। সে দুনিয়া তাঁর সহজ, সুন্দর হাসিটিকে জিইয়ে রেখেছে — অন্তত আমি তাই বুঝেছি। আর দেখেছি বয়স ঘোলাটে করে দিতে পারেনি তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে। সালতামামি, তথ্য, রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস থেকে শুরু করে হালের কোনও বই — সব ক'টা রিডে আঙুল রেখে যে সুরে তিনি পৌছোন, তা একান্ত ভাবেই তাঁর — অনন্য।

বলতে বলতে হারিয়ে ফেলছি কালক্রম। হারিয়ে যাচ্ছে অতীত, বর্তমানের পার্থক্য। পর্দায় যেন ভেসে উঠছে শেষবার কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা হবার দিনটি। ঘরে ঢুকে দেখেছিলাম, মাটিতে খবর কাগজ বিছিয়ে পড়ছেন জ্যেঠু। ভীষণই চেনা দৃশ্য। আসলে জ্যেঠু জানতেন, মাটির সঙ্গে লেগে থাকাতেই শক্তি। এই সহজ কথাটা আমরা কিন্তু অনেকেই ভুলে যাই।

জ্যেঠুর আরেকটা দিক আমাকে ভারি আকর্ষণ করত — অন্যকে উৎসাহিত করার ক্ষমতা। জ্যেঠু তখন খুব অসুস্থ — বাঙ্গালোরে। আমার লেখা পৌঁছেছে জ্যেঠুর কাছে। চিঠিতে আমাকে উৎসাহ জানালেন। পরে জেনেছি, তখন বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতকে ধরে তাঁকে লিখতে হত।

যে সব মানুষের কাছে গেলে মার্কসবাদে বিশ্বাস রাখা সহজ হয়, আমার জ্যেঠু তাঁদের একজন। চূড়ান্ত ঈশ্বর বিশ্বাসীর যে একমুখী ভক্তি — তা তাঁর সহজাত। সঙ্গে রয়েছে যুক্তিনিষ্ঠ মন। এই দুয়ের যুগলবন্দী নিয়ে এক কঠিন পৃথিবীর বুকে তিনি কুঁদে তোলেন এক অনন্য মুখ। সে মুখ ভালোবাসার — ব্যাপকতর মানুষের প্রতি সহানুভবী সেই মানুষটিই পীযূষ দাশগুপ্ত।

ভালোমেশো

সোমা দে

কেটলিটা জোরে সিটি দিল, আওয়াজটা অসহ্য, যেন কে আর্তনাদ করছে। মুখটা কোনমতে ধুয়ে ছুটে গেলাম। আগুন থেকে তারস্বরে চিৎকাররত কেটলিটাকে সরিয়ে দিলাম। এমন সময়ে ফোনটা বেজে উঠলো — যেন আরেক আর্তনাদ। ছুটে গিয়ে ফোনটা ধরলাম — এত সকালে কে ? India'র ফোন ? মনের কোনে ভয় .... আনন্দ দুই হল। 'হ্যালো দিদি" ছোটবোনের গলা ব্যাঙ্গালোর থেকে ভেসে এল। কিন্তু গলা ওর কাঁপছে কেন ! আবার মিশ্র অনুভূতি এল মনে। কি হয়েছে ? "ভালোমেশো আর নেইরে দিদি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে" কেঁদে ভেঙে পড়ল বোন। আমি স্তম্ভিত ! বিষাদ ভারে আমি পাশের সোফাটাতে বসে পড়লাম। বিদেশে থাকার বেদনা যা আমার মনের কোনে সর্বক্ষণ কান্নার রেশ নিয়ে লুকিয়ে থাকে সে আজ ভালমেশো কে হারাবার আঘাতে সব বাধন ঠেলে অশ্রুবন্যায় আমার সমস্ত অনুভূতিকে বিবশ করে দিল। আমি কোথায় ডুবে গেলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। বাড়ির সবাই যে যার কাজে বেরিয়ে গেল আমাকে আমার স্মৃতির খাতা নিয়ে একেলা রেখে।

প্রথমেই মনে হলো, এবার দেশে গেলে ভালমেশোকে পাব না আর। সেই সুন্দর শান্ত সহাস্য চেহারা সেই অদ্ভুত Confidence যা আজ আমাকে দিয়েছে যেন পৃথিবী জয় করার শক্তি তাঁকে আর দেখতে পাব না। দুঃখের অশ্রুধারায় অনেক কথা মনে পড়ে গেলো। রামধুন রঙ ছড়িয়ে ভেসে উঠল ছোটবেলার স্মৃতি। ভালমেশোর ভালবাসা আর তার অদ্ভুত প্রকাশ। আমাকে দেখলেই আমার Carefully বাঁধা Ponytail টা ধরে টেনে দিত। উঃ। ভীষণ লাগত। তার মধ্যে খুঁজে পেতাম স্নেহের সুখ। আমার বোঁচা নাক ধরে টেনে আমায় আদর দিত। আজ সবই মধুর বলে মনে হয় — ঐ ব্যথা আজ Priceless সুখস্মৃতি। সেইসব দিন যখন শৈশব কৈশোরের আঁধো অন্ধকার আধো আলোর বোধ-শক্তির মধ্যে বুঝতাম মেশো Political Activisit, লড়াই করছে কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য — দুষ্টুদের সাথে। পুরোটা বোঝার ক্ষমতা তখন ছিলনা। আমাদের বাড়িতে আমার মা বাবা উভয়েই মেশোকে গভীর শ্রদ্ধা করে, মেশো আসলে সেবা যত্নে উভয়েরই কী ভীষণ উৎসাহ দেখতাম। আমি বুঝতাম এই মেশো ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ - কোন অন্যায় সহ্য করে না। জীবনের সমস্ত ভাল থাকাকে তুচ্ছ করে নিজের তেজ ও আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে মেশো কোনদিন পিছনা হয় না। জীবন-মৃত্যু ছিল তার কাছে সামান্য, নিজের আদর্শের প্রতি তার অটল বিশ্বাস। আমাকে বিস্মিত করত। মেশোর কাছে কাছে থেকেছি কতদিন। কী ভীষন ভাল লাগত। ভাবতাম, আমি যাদের দেখি এ যেন আলাদা — শ্রদ্ধা হত।

আমাকে ভালোমেশো কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা লিখে বোঝাবার নয়। আমার

প্রতি কাজের শুরুতেই আমি করবই করব এমনি দৃঢ়বদ্ধ হই মেশোর কথা মনে করে। বিদেশে আঁকার প্রদর্শনীতে আমার ছবি পুরস্কৃত হলে নিরহঙ্কর মেশোর কথা মনে পড়ে। আমি আমার কাজে লেগে যাই। যা জীবনে সঠিক বলে ভেবে নিই সব সময়ে তা রূপায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই তাও মেশোর প্রভাবে। তাঁকে হারিয়ে আজ মর্মে মর্মে তাঁকে অনুভব করে চলেছি। আমার ছোট্ট জীবনে মেশো এক অপূর্ব শ্রদ্ধার প্রতিমা।

দুর্লভ মানুষ পীযূষ

ক্ষিতীন্দ্র চৌধুরী

আমার ভগ্নিপতি অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত। সুদর্শন, ভদ্র, উন্নত চেহারার মানুষ। আত্মীয় হওয়ায় গর্বিত বোধ করেছি। মেলামেশায় ইতস্ততঃতাও ছিল। রাজনীতি করা মানুষদের বিষয়ে আমার মনে বরাবরই একটু দূরত্ব থাকত। ফলে ওকে কাছে টেনে নেওয়াতে প্রথমটায় বিলম্ব হল। কিন্তু ওর মধ্যে এমন স্বতস্ফূর্ত আনন্দ ভালবাসা এবং আন্তরিকতা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ পেল যে আমি ওকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিলাম, ভালবাসলাম। যে বিষয়েই কথা হত যেমন মধুরতা দিয়ে তেমনি সহজ ভাষায় প্রাঞ্জল করে বলত। এক অনন্য সঙ্গ পেলাম। অভিভূত হতাম। আমার মা ছিলেন অত্যন্ত ভক্তিমতী মহিলা। ওকে অন্যান্য জামাইদের মতো ভাবতে পারেননি কখনও। নিজের পরমাত্মীয় মনে করতেন। সম্ভ্রমের সঙ্গে স্নেহও করতেন। পরিবারে পীযূষ আদৃত হল। বিশেষ করে ওর সঙ্গ আমাকে আকর্ষন করত। যেতাম থাকতাম।

পীযূষ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং সুস্পষ্ট ছিল। ক্রমে আমি বুঝতে পারলাম ওর আকর্ষণ আমার জীবনে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছে। ওর রাজনীতি বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নেই। তাকে শ্রদ্ধা করি তার বিশ্বাসে সে দীপ্ত ছিল। মাঝে মাঝে আমাদের পরিবারে ঐ রাজনীতির নানা সমস্যা এসে সাময়িক থমকে দিয়েছে কিন্তু ওর প্রতি আমাদের সবাকার শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও অনুরাগে আমরা সেসব দিনকে কাটিয়ে উঠেছি। কখনও ওর প্রতি বিরাগ জন্মেনি।

পীযূষ কলকাতা থেকে সুদূর বাঙ্গালোরে চলে যেতে মনে প্রাণে অনুভব করলাম সে আমার হৃদয়ে অনেকখানি জুড়ে ছিল। ওকে যেতেই হবে। আমি সেখানে গেছি কবার -— তেমনি আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়েছি দুজনে। উচ্ছ্বাসবিহীন গভীর অনুভুতি ওর আমি বুঝতে পারতাম। আমার মনে স্বামীজীর কথা মনে পড়ত। "ভাবোচ্ছ্বাসের নামগন্ধ না রেখে আত্মানুভুতির চেষ্টা করো"। অন্যদিকে দেখেছি সাধারণ লোকের প্রতি ওর মমত্ববোধ যা আমাকে আকৃষ্ট করত। কি বাড়ির কাজ কর্মের লোকের প্রতি, কি সাধারণ ইতরজনের প্রতি কারো কষ্ট না হয় সর্বদা সতর্কতা। কখনও কখনও অসুস্থ সাধারণ অনাত্মীয় লোকের প্রতি এমন নির্বিকার সেবা করতে দেখেছি চমৎকৃত হয়েছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী মনে আসত — 'শিব জ্ঞানে জীবে সেবা।'

পীযূষের জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম। ওর বই সব আমার পড়া নয়। রাজনীতির তত্ত্বকথা এড়িয়ে কিছু পড়েছি। দেখতাম তত্ত্বের রূঢ়তার সঙ্গে সরসতাও সরলতা কি অনায়াসে তার কলমে ফুটে উঠত। ওকে জীবনে কখনও বিরস দেখিনি। হাসি আর আনন্দ দুই দুর্লভ গুণ ওর করায়ত্ত ছিল। ওর উদাত্ত হাসি কানে আজও বাজে। এহেন পরমাত্মীয়ের বিয়োগে কলমে কতটুকু লেখা যায়।

ফোনে ফোনে সুদূরে কথা হত। কুশল বিনিময় তারপরই আমাদের মঠ মিশনের

সমাজসেবার কাজের কথা হত। অনুভব করতাম পীযূষ সঙ্গীর পথ চেয়ে আছে। ওর নিঃশ্বাস কষ্টটা কলকাতা থাকতেই ছিল। খবর নিয়েছি বড় ডাক্তারের ওষুধ নিয়মিত খাচ্ছে। বাঙ্গালোরেও সেই চিকিৎসা হচ্ছিল। হঠাৎ কী এক আকর্ষণে বাঙ্গালোরে গিয়ে পৌঁছুলাম গত ৯ই আগষ্ট। কে যেন আমায় টেনে এনে পৌঁছে দিল। পীযূষ আমার পেয়ে বড় খুশি। আতিথেয়তায় এত বেশি ও ব্যস্ত হয়ে গেল। আমি ওকে আশ্বস্ত করি বেশ কদিন থাকব তোমার কাছে। দেখলাম পীযূষ চলাফেরায় ভালই আছে। কোনদিন পীযূষের মত রাজনীতি চঞ্চল মানুষকে আমি সংসারে সব কিছু খেয়াল রেখে স্বচ্ছন্দে চলতে দেখিনি। আজ ওখানে ওকে সুন্দর পরিপাটি পরিচ্ছন্ন বাড়িতে সুন্দর পরিবেশে আনন্দে চলতে দেখে খুবই আনন্দ হল আমার। পীযূষ ভালভাবে আছে।

পীযূষ খেলা ভালবাসত (ক্রিকেট, ফুটবল)। রাজনীতির প্রত্যক্ষ জগৎ ছেড়ে সময়টা কেমন করে কাটত ! এক লেখাপড়া দুই খেলা। খেলা বিষয়ে ওকে দক্ষ খেলোয়াড়ের মত আলোচনা সমালোচনা করতে শুনেছি। খেলা প্রেমিক কয়েকজন যুবক ওর সঙ্গে খেলার শেষে ফোনে যোগাযোগ করে মতামতও নিত শুনেছি। সেসময়ে খেলা নিয়ে আমার আর পীযূষের মধ্যে আবার খুব জমে উঠেছিল। এর মধ্যে কলকাতা থেকে ফোন আসে। লেখা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা ও বলতে লাগল। বার বার বলল 'আমি তোমাকে লিখে দেব' আমার শরীর ভাল নেই। আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কে জানত ওর ব্লাড প্রেসার কোথায় নেমে যাচ্ছে ! কিছুক্ষন বিছানায় শুয়ে রইল। পীযূষ তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ? না একনাগাড়ে কথা বলেছি তাই। ডাক্তারের ওষুধ দেওয়া হল। সে দিন রাতে ওর ভাল ঘুম হলনা। ১২ই আগষ্ট ভোরে ডাক্তার ডাকা হবে ঠিক হল। বৌমা রাতেই ডাকতেই চেয়েছিল কিন্তু পীযূষই ডাক্তার ডাকতে বারণ করল ওষুধ দেওয়া আছে খেলেই চলবে। যাক্ সকাল বেলাতে ডাক্তারখানায় যেতে নিজে নিজে তৈরী হল ! এমনিতে জামা কাপড়ের প্রতি ওর চিরাচরিত 'হলেই হল' ভাব ছিল সেদিন ধোপার ধোয়া পাঞ্জাবী পাজামা নিজেই পড়ে রেডি হল। ছেলে স্ত্রী কাউকেই সঙ্গে নিতে চাইছেনা। ওর এমন কিছু হয়নি। স্ত্রী সঙ্গে গেল। ড্রাইভার গাড়িতে তুলে দেবে ধরতে আসতেই বিরক্ত হল — প্রয়োজন হবে না গেটের কাছে গাড়ি, না উঠে ফিরে এসে আমায় বলে তুমি একটু কাগজ পড়, T.V. দেখ খাওয়া দাওয়া তোমার পছন্দসই কর আমরা আসছি। কাজের মেয়েকে ডেকে মামাবাবুর কোন অযত্ন না হয় দেখতে বলে গেল। আমি উঠে এসে ওকে আগে ডাক্তার দেখাতে যেতে বলি। ও রওনা হল ওর বড় বড় পায়ে হাঁটা ওর হাসি মুখে হাত নাড়ানো সব বড় স্বাভাবিক ছিল। কে জানত এযাত্রা হবে চিরদিনের। সেসময়ে বুঝতে পারলাম পীযূষ আদর্শ হিসাবে যা করবে, ভালবেসে যা করবে মনে করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা উঁচু করে তা করার চেষ্টা করে। এই দৃঢ়তা আর বিনয় নিয়ে ওকে জীবন যুদ্ধে বহুবার বড় সংগ্রাম করতে হয়েছে। এবং এই দৃপ্ততাই ওকে আজ পৌঁছে দিয়েছে জীবনের পরপারে। কি স্থির মস্তিষ্কে শারীরিক সমস্যার বিষয় ঐ সময়ে ডাক্তারবাবুকে বুঝিয়ে দেওয়া অথচ রক্তহীন দেহ প্রেসারের তবস্থা মুমূর্ষুর। আমি খবর পেয়ে ছুটে গেলাম, ছেলে এল। মনিপাল হাসপাতালে গিয়ে কয়েক ঘন্টা ওর হাসি আর আনন্দ মাখা মুখ দেখার

অপেক্ষায় রইলাম আমি। হাসতে হাসতেই পীযূষ চলে গেল আমাদের এক দীর্ঘ শূন্যতায় ফেলে। মনিপাল হাসপাতাল থেকে অন্য কোথায় ও চলে গেল এর ঠিকানা আমি জানিনা। এক মাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণেই এর স্থায়ী ঠিকানা আমার বিশ্বাস।

অন্য চোখে

স্বস্তি দাশগুপ্ত

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তর সাথে প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবন কাটিয়েছি। সেই অসাধারণ উপলব্ধিময় জীবনে আমার ছোট্ট তরী তার বিপুল তরঙ্গে ভেসে এসেছে শুধু শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর বিশ্বাসকে সম্বল করে। তিনি ছিলেন তেমনই মানুষ। সরল সাদাসিধে জীবন যাপন, উজ্জ্বল প্রগতিশীল চিন্তা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই। তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান, গভীর উপলব্ধি এবং স্পষ্ট অথচ মাধুর্যময় প্রকাশ ভঙ্গী আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। একটু দূরত্বে বসে ওঁর কথা লিখতে বড়ই কঠিন মনে হচ্ছে।

পুরো সংসারী মানুষ তিনি কখনও ছিলেন না। আমাদের বিয়ের কয়েকদিন আগে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন। বলেছিনেন — "আমাদের জীবনে পার্টি প্রথম, দ্বিতীয় আমার মা-বাবা, তৃতীয় তুমি। কথা দাও যে এর অন্যথা কখনও আশা করবে না। আমার রাজনীতির পথে কোন বাঁধা আমি সহ্য করব না।"

রাজনীতির বিষয়ে আমার সম্যক জ্ঞান না থাকলেও ওকে কথা দিতে আমার সেদিন কোনও দ্বিধা হয়নি। আমার মত এক সাধারণ নারীকে তিনি তাঁর অমূল্যগুণে আদৃত করেছেন জেনে জেগে উঠেছিল এক অদ্ভুত গর্ব আর একই সাথে জন্ম নিয়েছিল এক অপরিহার্য দায়িত্ববোধ। তাই তাঁর সটান ভাবে চলার পথে, সাথী হিসেবে যে বিভ্রাট আমাকে সামলাতে হয়েছে তাতে রাগে, বিরাগে কখনও কোন বিমর্ষতা ঠাঁই পায়নি। এই দীর্ঘ পথে রাজনৈতিক সংকট, আর্থিক সংকট, শোক, দুঃখ, আঘাতের মধ্যে তাঁকে দেখেছি কখনও হাসি মুখে, কখনও বা করুণ হৃদয়ে আরক্ত নয়নে সহ্য করতে। পাশে ছিলাম। সাধ্যমত তাঁর ব্যথার ভাগ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। অনবরত ভেবেছি, "ওঁর সাথে ঠিক মত চলতে পারছি তো ?"

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে, আমার "সেজদা" তখন শ্রদ্ধেয় বিধান চন্দ্র রায়ের দাদা সাধন চন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত কারখানা এম. এম. এম. সি'র জেনারেল ম্যানেজার। কোম্পানীর এম.ডি. ছিলেন সাধন চন্দ্রের পুত্র সুকুমার রায়। দাদার কর্মসূত্রে মা সহ আমরা, ভাই বোনেরা, তখন দমদমে সেই কারখানা চত্বরেই জি.এম, কোয়ার্টার-এর বাসিন্দা। একদিন কোনও অদৃশ্য অঙ্গুলীহেলনে কারখানায় লক-আউট ঘোষণা হল। গেটের বাইরে শত শত শ্রমিকের পিকেট্ ও মিটিং, গেটের ভিতরে আমাদের উৎকণ্ঠা ও কোম্পানীর কড়া পাহারা। এমন সময় উপস্থিত হলেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। সবকিছু দেখেশুনে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। আমাকে বললেন,

—"বাইরে কয়েক'শ মানুষ অভুক্ত ; তোমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করছ কি করে ? শোনো, এই লক - আউট না উঠলে আমি আর এই বাড়ীতে পা রাখবো না।" তখন আমাদের বিয়ে হয়নি, লক-আউটের সম্পূর্ণ অর্থও আমার অজানা, সন্ত্রস্ত হয়ে 'সেজদা'কে ডেকে আনলাম। ঋজুদেহের বিরাট মানুষ সেজদা আচার্য ত্রিগুণা সেনের প্রিয় ছাত্র, ডঃ বিধান রায়ের

প্রিয় ইঞ্জিনীয়ার মণীভূষন চৌধুরী। বাড়ীর বাইরে বাগানে হাঁটতে হাঁটতেই দুজনের আলোচনা হল। অধ্যাপকের সেই একমুখী একরোখা ভাব আমায় বিরক্ত করেছিল। ফিরে এসে, আমার বিরক্তি দেখে সেজদা ক্ষুণ্ণ হলেন। আমাকে বোঝালেন অধ্যাপকের মনের কথা, আদর্শের কথা। আমি অবাক হলাম, সেজদার কথায় যেন অধ্যাপকেরই কথার প্রতিধ্বনি। সেজদা ওঁকে কথা দিয়েছিলেন যে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এরপর ১৯৫৪ সালে আমাদের বিবাহ। এক উজ্জ্বল মানুষের সংস্পর্শে এসে জীবন এগিয়ে গেল "নব নব পূর্বাচলে, আলোকে, আলোকে" জন্ম নিল আমাদের প্রথম পুত্র, যার নাম উনি রাখলেন 'সোহম'। আমরা শ্যামবাজারে, বলরাম বোস স্ট্রিটে, একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটভাড়া নিলাম। দোতলায় একটি ঘর আর সঙ্গে লাগোয়া উঠোনের মত একটি ছোট্ট ছাদ। উনি তখন মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। বাড়ীর কাছেই কলেজ, কাজেই ছুটির পরই বন্ধু অধ্যাপকেরা এসে আমাদের খোলা ছাদে শতরঞ্চী বিছিয়ে আড্ডা জমাতেন। দেখতে না দেখতে শুরু হত জম-জমাট আলোচনা আর তর্ক। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য কিছুই বাদ যাওয়ার জো ছিলনা। আমার দেওর শঙ্করও তখন মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজেরই অধ্যাপক এবং সেই ছাদের আড্ডায় পূর্ণ সদস্য। ওঁর দাদা ভালোবেসে বলতেন, "শঙ্কর আমাদের পতাকা বাহী।" অধ্যাপক সুখরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় বলতেন "পীযূষদার ভ্রাতৃপ্রেমের তুলনা হয় না"। মনে পড়ে বাংলার রবীন্দু গুপ্তকে। বীরবলী ভাষা, ভঙ্গীতে পরশুরাম, তর্কে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতেন অনায়াসে। মনে পড়ে আরও কত তরুন প্রাণবন্ত মুখ, মানিক বল, প্রাণকুমার মুখার্জ্জী, নবকুমার নন্দী, সত্যেন চ্যাটার্জী, কল্যান দত্ত, পাঁচুগোপাল দত্ত — প্রত্যেকে স্বকীয় ভঙ্গীতে সেই ছাদের হাট -এর তারকা। ঐ বাড়ীর একতলায় থাকতেন দুই বন্ধু, দুজনেই ইঞ্জিনীয়ার। তাঁদের কোম্পানী ছুটি হলেই অন্য সব আড্ডা ফেলে ছুটে আসতেন বাড়ীতে, আমাদের "ছাদের হাটে" যোগ দিতে। বলতেন এর থেকে ভাল আড্ডা আর কোথায় পাব? আমার কাজ ছিল উপস্থিতদের চা-পানে আপ্যায়িত করা। সেই সামান্য সেবার পরিবর্তে সেদিন যা পেয়েছি, যা শিখেছি, তা অমূল্য। কিন্তু জীবন কে জানতে আরও কত বাকি ছিল তা তখনও বুঝিনি।

সোহমের বয়স তখন চার। মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের অধ্যাপিকা হাসি চক্রবর্তীর প্রতি প্রিন্সিপাল অনিল ব্যানার্জীর অবিচারের প্রতিবাদে এক বিরাট লড়াই এর নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। তারই বদলা নিতে ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ওঁকে বরখাস্ত করলেন। সেই সময়েই উপলব্ধি করলাম আমাদের দ্বিতীয় সন্তানের সম্ভাবনা। একইসাথে আমি বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। অধ্যাপকের কর্মচ্যুতির সংবাদ এল বজ্রাঘাতের মত। শুরু হল দুর্যোগের দিন। সেই দুঃসময়ে যে সব হৃদয়বান মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে অধ্যাপক শৈলেশ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক পি. সেন ও তাঁর স্ত্রী নমিতা সেনকে ভুলতে পারি না। এক এক দিন আমার রান্না ঘরে ঢুকে পড়তেন। আমাদের ব্যবস্থা দেখে নিজেরাই নানা আয়োজন করে দিতেন, কোনও আপত্তিই শুনতেন না।

ইতিমধ্যে পীযূষ দাশগুপ্তর বরখাস্তর প্রতিবাদে শুরু হল তুমুল ছাত্র ও অধ্যাপক

আন্দোলন। ছাত্রদের অনশন ও প্রতিবাদ সভা চলল দিনের পর দিন। এই অবস্থায় পুরোপুরি ভাবে অধ্যাপকের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি নিজের পরীক্ষায় বসার পরিকল্পনা বাতিল করলাম। শুনে উনি কুণ্ঠিত হলেন, বললেন, "তোমার বড় ক্ষতি হয়ে গেল"। ঠিক করলাম পরের বার পরীক্ষায় বসব।

অবশেষে তৎকালীন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য শ্রদ্ধেয় নির্মল সিদ্ধান্ত মহাশয়ের হস্তক্ষেপে সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের অবসান ঘটল। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, পীযুষ দাশগুপ্তর বরখাস্ত পত্র প্রত্যাহার করা হবে। আন্দোলন সমাপ্ত হল, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা হল না। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনার সেই দীর্ঘ দিনগুলোয় শুধু ভাবতাম, যে শিশুটি জন্মের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে, তাকে এই অবস্থায় কিভাবে পৃথিবীর আলো দেখাব ? ঠিক সেই সময়েই আমাদের বাড়িওয়ালা অবিলম্বে ফ্ল্যাট খালি করার নোটিস্ দিলেন। পীযূষবাবু তার সাথে সাক্ষাত করে, আমার অবস্থা তাকে জানিয়ে কয়েক মাসের সময় চেয়েছিলেন। বাড়ীটির মালিক নিজে একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপকের সেই অনুরোধ রাখতে রাজী হননি। কয়েকদিনের মধ্যেই নার্সিংহোম থেকে সদ্যজাত শিশু সহ আমরা দমদমে, সাউথ সিঁথিতে একটি স্বল্প ভাড়ার বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। ধুলো সাফ করে সংসার পাতা হল কিন্তু দুর্যোগ কাটলা না। দুদিনের মধ্যেই সাংঘাতিক ইনফেকশনে নবজাতকটির জীবন সংকট দেখা দিল। দুর্বল শরীরে আমার মনবলও যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সেই অসহায় অবস্থায় আমার শাশুড়ি-মায়ের (সুহাসিনী দেবী) যে অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম তা আজও মনে পড়ে। তাঁর সেবায় ও ডাক্তারের চিকিৎসায় অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠল আমাদের দ্বিতীয় পুত্র 'সত্তম'।

মনীন্দ্র কলেজের পালা শেষ হল, কিন্তু চলতে লাগল অধ্যাপক দাশগুপ্তর রাজনৈতিক সংগ্রাম। অনুগামী ছাত্ররা, বন্ধু অধ্যাপকেরা ও ভাই শঙ্কর দাশগুপ্ত সর্বক্ষন ওঁর পাশে ছিলেন। ইতিমধ্যে পার্টিতে ফাটল ধরেছে। শ্রী দাশগুপ্ত পূর্ন সময়ের জন্য অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কাজে ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর দায়িত্ব নিলেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কম: মুজফ্ফর আহ্মেদ ছিলেন তাঁর আদর্শ মানুষ, আর গভীর শ্রদ্ধা করতেন প্রমোদ দাশগুপত, সমর মুখার্জ্জী, গণেশ ঘোষ ও অন্যান্য অগ্রজ প্রতিম কমরেডদের। বিভিন্ন নেতাদের সাথে পার্টির আদর্শগত লাইন নিয়ে প্রচন্ড উত্তেজনাপূর্ন মিটিং চলত। আমায় কিছুই বলতেন না। আভাসে বুঝতাম পার্টি ভাগ হতে চলেছে। দু'পক্ষেরই উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ন প্রকাশনা সংস্থা ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর দখল রাখা। বাড়ী ফিরতে রোজই গভীর রাত হত। একটি সদ্যজাত আর একটি পাঁচ বছরের শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে জেগে থাকতাম। এমনই এক অবিশ্রান্ত বরষার রাতে প্রায় দু'টো নাগাদ কাক ভেজা হয়ে বাড়ী ফিরলেন। আমার ধৈর্য্য রইল না, ক্ষোভে ফেটে পড়লাম। অবাক হয়ে দেখলাম যে সেই কঠোর ভাবে নিষ্ঠাবান মানুষটির মুখে এক শৈশব হাসি। অদ্ভুত কমনীয় ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি আমারই সমব্যথী। তারপর বুকভরা আনন্দের সাথে জানালেন "ন্যাশনাল বুক এজেন্সী আমাদেরই রইল"।

এই ন্যাশনাল বুক এজেন্সী বা এন. বি. এ. ছিল ওঁর তীর্থ স্থান এক সময় তিনি হলেন

এন. বি. এর অন্যতম কর্ণধার। দেশ ও বিদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার প্রকাশ ও অনুবাদ হত তাঁরই তত্ত্বাবধানে। এই সময়েই ইংরাজী 'ক্লাসিক' শব্দটির বাংলা পরিভাষা স্থির করতে সম্ভবত তিনিই প্রথম 'চিরায়ত' কথাটি প্রয়োগ করেন।

মাদারিপুরের আড়িয়ালখা নদীর পারের মানুষ পীযূষ দাশগুপ্ত, সেই নদীর মতই আবেগ প্রবণ। কিন্তু একই সাথে, সত্য, যুক্তি ও বুদ্ধির প্রতি তার নিষ্ঠা ছিল ঈর্ষাজনক। ফলে কখনও আন্দোলনের উত্তাপে, আবেগের তাড়নায় কোনও ভুল হয়ে থাকলে অচিরেই বিনম্রচিত্তে তা সংশোধন করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। স্বভাবের এই বিশেষত্বটি তাঁর চেহারায় এক সম্ভ্রান্ত সৌন্দর্য হয়ে প্রতিভাত ছিল।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত স্বভাবের আর একটি বিশেষগুণ আমার মত আরও বহু মানুষকে শ্রদ্ধাপ্লুত করেছে, সেটি হল — অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর অপ্রতিরোধ্য দরদ। এই দরদ তিনি এমন বহু মানুষের প্রতি উজাড় করে দিয়েছেন যাদের সমাজে অনেকেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য করেন। ওঁর শ্যামবাজারের কোচিংটি সামান্য মাইনেতে দেখাশোনা করতেন এক বৃদ্ধ মানুষ, পান্নাবাবু। এই রুগ্ন মানুষটি একবার ভেদবমি ও ডায়েরিয়ায় মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হন। অধ্যাপক প্রভাস সিংহর কাছে শুনেছি সেই মানুষটিকে নিজের হাতে 'পীযূষবাবুর' সেবা করার বর্ণনা। বলতে বলতে প্রভাসদার কণ্ঠস্বরও আবেগে আপ্লুত হত।

৬০ এর দশকে রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সাথে আমাদের রুটি-রুজির সংগ্রামও চলছিল। অধ্যাপক দাশগুপ্ত শ্যামবাজারে, সার্কুলার রোডে একটি কোচিং খুললেন : নাম রাখলেন 'এডুকেশন মিশন'। সঙ্গে ভাই শঙ্কর, বন্ধু প্রভাস সিংহ ডঃ বাসব সরকার ও আরও কয়েকজন। ছাত্রছাত্রীর অভাব হয়নি তাই প্রতিষ্ঠানটি বড় হতে সময় লাগল না। কিছুদিনের মধ্যেই দমদম ষ্টেশনের কাছে খোলা হল 'এডুকেশন মিশন' এর আর একটি শাখা। এখানেও ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় জমল। জীবনে উত্থান পতন থাকলেও সংগ্রামে ছন্দপতন ঘটেনি। এরই মধ্যে কেটে গেছে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী। অনুষ্ঠানে গানে, তাসের দেশ, চন্ডালিকায়। পার্কসার্কাস ময়দানে ভোর হয়েছে নিখিল ব্যানার্জীর সেতারে। আমি বি. এ. পাশ করলাম। সোহম ভর্ত্তি হল স্কটিশচার্চ স্কুলে। ওর পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মশাই। অধ্যাপক দাশগুপ্তর বাবা, গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত ছিলেন একজন দুর্লভ ব্যক্তি। অনমনীয় নীতিবোধ আর গভীর স্নেহশীলতার সাথে একজন অতুলনীয় অভিভাবক। ১৯৬৪ সালে মাত্র বাষট্টি বৎসর বয়সে আমাদের শোকস্তব্ধ করে উনি চলে গেলেন।

বাবার মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই পার্টি বে-আইনী হল, নেতারা বন্দী হলেন। পীযূষ দাশগুপ্ত গেলেন আত্মগোপনে। ঘটনার মাত্র একদিন আগে আমরা দমদম ছেড়ে বাগবাজারের পশুপতি বোস লেনে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে চলে এসেছি। বাড়ীটি বিখ্যাত তবলা শিল্পী পন্ডিত শঙ্কর ঘোষেদের পরিবারের। শঙ্করবাবু থাকতো একতলায়, আমরা দোতলায়। মাঝরাতে শঙ্করবাবুর বাড়ীতেই ফোন এল। ওঁর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে অধ্যাপক দাশগুপ্ত ফোন ধরতে নেমে গেলেন।

ফিরে এসে বললেন "শুভ, আমাকে যেতে হবে, এখনই"। উনি চলে গেলেন। আমার মনে হল উনি বড় স্বার্থপর, চরম স্বার্থপর। তা না হলে এক মুহূর্তে নিজেকে নির্লিপ্ত করে উনি মুক্ত হলেন কি করে ?

পার্টি বেআইনী হল। অধ্যাপক গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপনে গেলেন। অচেনা পাড়ায়, অজানা পরিস্থিতির মধ্যে দুটি শিশুকে নিয়ে আমি দিশাহারা। পার্টির কর্মীরা, ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্য খবরাখবর নিত। শঙ্করবাবুর এক কাকীমা ছিলেন শোভাবাজারের কমরেড রথীন দেবের বোন। তাঁর সাথে হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। শঙ্করবাবুদের সম্পূর্ন পরিবারটিই অতি ভদ্র। প্রায় সবাই শিল্পীসুলভ মনের মানুষ। কয়েকদিনের মধ্যেই সন্তান সহ বাগবাজারের প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশ নির্ভয় বোধ করতে লাগলাম। আমার দেওর শঙ্করও তখন পাশেই ছিল। ধীরে ধীরে সোহম একা স্কুলে যেতে শিখল আর আমি শিখলাম একলা সংসার করতে। কদাচিৎ কয়েকটি গোপন আস্তানায় অধ্যাপকের সাথে খুবই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত হত। এক গাল দাড়ি, প্রথমটায় কেমন অচেনা মনে হয়েছিল। বলতেন "আমাদের দিন আগত প্রায়....... "এদেশের আকাশে হবে নতুন অরুণোদয়।" আমি বুক ভরা আশা নিয়ে দুই ছেলের হাত ধরে বাড়ী ফিরে আসতাম। সেই সময়ে আমার দুই ভগ্নিপতি সুধীন ও শ্যামলদার সাহায্য আমি ভুলি না।

এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা আমার জীবনের অন্যতম স্মৃতি। একসাথে দুই ছেলের প্রবল জ্বর আর আমিও ব্রঙ্কাইনাল যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী। বেশ রাতে যখন কাশির সাথে রক্তও দেখা দিল, ছেলেদের কথা ভেবে বড্ড অসহায় হয়ে পড়লাম। কোনও রকমে শঙ্করবাবুর ফোন থেকে খবর দিলাম আলিপুরে, সেজদাকে। প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির রাতে সেজদা গাড়ী পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমার অবস্থা দেখে দাদা ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। সেই ঝড়ের রাতে কোনও ডাক্তারও পাওয়া গেল না। হঠাৎ মধ্য রাত্রে বাইরের লোহার গেট খোলার শব্দ, তারপরই দরজায় টোকা পড়ল। এত রাতে কে? দরজা খুলতেই আগন্তুক ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁকে দেখে সবাই অবাক, আত্মহারা মুখে সেই দাড়ি, সেই হাসি নিয়ে আমার পীযূষ দাশগুপ্ত। খিদিরপুরে গোপন মিটিং থেকে ফিরছিলেন, সন্দেহ হল পুলিশ পিছু নিয়েছে। তাই মাঝপথে ট্যাক্সী ছেড়ে অলিগলি হয়ে এই বাড়ীতে। দু'-দিন এক সাথে ছিলেন।

সেই আত্মগোপনের দিন গুলোয় অমানুষিক পরিশ্রম করতেন, জেলে বন্দী নেতাদের সাথে যোগাযোগ, জেলায় জেলায় গোপনে সংগঠন, গণ আন্দোলন আর তার সাথে নিজের পড়াশোনা, লেখা, এমনকি রান্নাও। নিজে কিছুই বলতেন না, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝতে পারতাম সবই।

আমি তখন স্কুলে পড়াই। চাকরী না করে উপায় ছিল না, কিন্তু দ্রুত শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। তখন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ, রাতে ব্ল্যাক-আউট আর দিনে পুলিশের টিকটিকি পেছন পেছন ঘুরছে। স্কুলে যাওয়ার পথে ছেলেদের একলা পেলেই তারা চেপে ধরত, প্রশ্ন করত বাবার সাথে দেখা হয় কিনা। ভয়ও দেখাত। ছেলেরা তবু কোনওদিন মুখ খোলে নি। এই দিনগুলোয়

যখন শঙ্করবাবু একতলা থেকে হাঁক দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন, ভরসা দিতেন, কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসতো। আমার চিকিৎসার খোঁজ নিতে আসতেন দেবতা প্রতীম মানুষ কমঃ মোহিত মৈত্র। ঋষিতুল্য স্বভাব ও চেহারার এই বৃদ্ধ মানুষটি তখন নিজেই দুরারোগ্য ক্যান্সারে দিন গুণছেন। তবু আসতেন। অন্যান্য আত্মীয়, ছাত্র, বন্ধু, কমরেড সবার নাম এই স্বল্প পরিসরে স্মরণ করা যাবে না কিন্তু হিরন্ময় সান্যাল-এর কথা না বললে অপরাধ হবে। ওর ডাকনাম 'মঞ্জু' । অধ্যাপক দাশগুপ্তর ঘনিষ্টতম অনুগামী। মঞ্জুর অভিভাবক সুলভ ব্যাক্তিত্ব আমাদের সর্বদা সাহস যোগাতো। আর একজনের নাম না করে পারি না, সে হল ওঁর ছাত্রী অঞ্জলী। সারাজীবন ধরে এমন নিঃস্বার্থ ভাবে কেউ তার 'মাষ্টারমশাই' এর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসায় সমস্ত পরিবারের এত আপনজন হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অঞ্জলী।

১৯৬৭-র ইলেকশানের কিছুদিন আগে অধ্যাপক দাশগুপ্ত বাড়ী ফিরে এলেন। সেই এক গাল দাড়ি আর নেই। চিরপরিচিত ঝক্‌ঝকে হাসির সাথে চোখে পড়ল তাঁর মুখে লিভার স্পট্। দীর্ঘ দিন পর ওঁকে নিজেদের মধ্যে ফিরে পাওয়ার উচ্ছাস আমি এবং দুই ছেলে চেপে রাখতে পারিনি। কিন্তু বাড়ী ফিরেই উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এলাকার মানুষদের সাথে দেখা করার জন্য। উচ্ছসিত কমরেডরাও বাড়ী এসে হাজির। জানলাম কাশীপুর বিধানসভায় কংগ্রেসের সুশীল পাল ও ফরওয়ার্ড ব্লকের বর্ষীয়ান নেতা হেমন্ত বসুর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন কমঃ পীযূষ দাশগুপ্ত। ওঁর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ছিল, একবার ডাক্তার দেখাতে অনুরোধ করলাম। কানে নিলেন না। মেতে উঠলেন মিটিং, মিছিল আর প্রচার নিয়ে। সামান্য কিছু ভোটে পরাজিত হলেন সুশীল পালের কাছে। হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এলেন, তাঁর মুখে বিষাদের লেশ মাত্র ছিল না। কমরেডদের কাছে শুনেছিলাম জয়ী হলে সেবার তিনি প্রথম যুক্তফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রী হতে পারতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ওর কাছে 'কমরেড' কথাটি ছিল এক যাদু মন্ত্রের মত। যখন 'কমরেড' বলে ডাক দিতেন সে ডাক আসতো তাঁর মনের গভীরতম কেন্দ্র হতে। আর কেউ যদি তাঁকে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করতেন সাড়া দিতেন সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে। নানান সংকটের দিনে ওঁ যখন চিন্তায় মগ্ন, বুঝতাম মনের মধ্যে একের পর এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, আমি হেসে বলতাম "কমরেড চা খেয়ে নাও"। চিন্তায় হয়তো বাধা পড়ত, কিন্তু মুহূর্ত্তে মুখে ফুটে উঠতো এক উজ্জ্বল হাসি, এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি। তাঁর সেই হাসি আমাকেও মুহূর্ত্তে ভুলিয়ে দিত সংসারের সব দুঃখ, কষ্ট ও সংকট। শুধু একটাই দুশ্চিন্তা হত। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি ওঁর ভয়ঙ্কর উদাসীনতা আমাকে শংকিত করে রাখতো। আশংকা অমূলক ছিল না, ৬৭-র নির্বাচনের কয়েক মাস পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদিন রাতে, অপেক্ষা করে বসে আছি, অবশেষে বাড়ীতে ফিরলেন, ভীষন জ্বর নিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা টুকুও ছিল না। শুধু জানালেন প্রমোদবাবুর সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ন মিটিং ছিল। পরদিন সকালেই ডাক্তারবাবু এলেন, শ্রদ্ধেয় ডঃ শর্মা, চিকিৎসা শুরু হল, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই অবস্থা আরও জটিল হল, ডাক্তারবাবুও উদ্বিগ্ন হলেন। অন্যান্য ডাক্তারদেরও ডেকে আনলেন। অসহায় হয়ে প্রমোদবাবুকে ফোন করলাম, অবশেষে এলেন ডঃ বিনয় ভট্টাচার্য, রোগীকে পরীক্ষা করেই প্রায় সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। দেরী হয়ে

গিয়েছিল. পথেই লিভার অ্যাবসিস্ ফেটে পুঁজ ছড়িয়ে পড়েছিল শরীরের প্রতিটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। ছাত্র, কমরেড. বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনেরা উৎকণ্ঠিত, বাঁচার আশা খুবই কম। মুজফ্ফর আহমেদ. প্রমোদবাবু প্রমুখ নেতারা ডাক্তারবাবুর সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখছিলেন। কমঃ বি. টি. রণদীভে সস্ত্রীক ছুটে এলেন হাসপাতালে। ডঃ বিনয় ভট্টাচার্য অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিলেন, বললেন "আপনারা রক্তের ব্যবস্থা করুন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই। প্রিয় মানুষ "পীযূষদার" জন্য রক্তের অভাব হল না। যাঁরা রক্ত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মনীন্দ্র কলেজের তরুন কর্মী "হর"-র নাম মনে পড়ে। আমি রাতের আঁধার আকাশের তারাগুলির দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলাম। অপারেশন শেষ হতে জানতে পারলাম "এখনও আশা আছে।" ছোট দেওর বাসব.তার কমরেড বন্ধুদের নিয়ে হাসপাতালেই রাতের পর রাত জেগে কাটাল।

কয়েক মাস বাদে অধ্যাপক দাশগুপ্তকে যেদিন আবার বাড়ীতে নিয়ে আসা হল তখন তাঁর কঙ্কালসার দেহ, দগদগে বেড-সোর। অপারেশনের ঘা তখনও শুকোয়নি, ড্রেসিং চলছে। কথা বলতে পারতেন না, শুধু তাকিয়ে থাকতেন। প্রতিবেশীরা দেখে আঁতকে উঠলেন। আমার 'কমরেড' ঘরে ফিরে এসেছে এই আমার কাছে ঢের ছিল। বিশ্বাস ছিল যেভাবেই হোক ওঁকে সুস্থ করে তুলব। প্রায় ছ'মাস বাদে, উনি একদিন আমাদের হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। দুর্বল শরীর নিয়েই নেতাজীনগর কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিলেন। বহু বছর বাদে কলেজের কাজে যোগ দিয়ে ওঁর উৎসাহ উদ্দীপনা আবার ফিরে এলো। কলেজকে গড়ে তোলার কাজে মেতে উঠলেন। কিন্তু নিজের নামের আগে " অধ্যাক্ষ" শব্দটির চেয়ে "অধ্যাপক" সম্বোধনটিই ওঁর বেশী প্রিয় ছিল। বাগবাজার থেকে টালিগঞ্জ রোজ বাসে যাতায়াত ওঁর পক্ষে কঠিন হচ্ছিল, তাই আমরা টালিগঞ্জে চলে এলাম।

কলেজ ক্রমে বড় হতে লাগল। শুধু বিল্ডিং নয়, শিক্ষা প্রসারে, ছাত্র সংখ্যায়, খেলাধুলায় সব দিকেই। তখন কলেজ তাঁর আর এক সংসার। অধ্যাপক থেকে শুরু করে সমস্ত পদের কর্মীরা, কেউ তার অনুজপ্রতীম অথবা সন্তান সম। ইঁট, বালি, সিমেন্ট থেকে শুরু করে চেয়ার-টেবিল, লাইব্রেরীর বই, মাসান্তের মাইনে যোগাড়ের জন্য আবার অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করে দিলেন। সঙ্গে চলছে তাঁর রাজনৈতিক জীবন।

চিরকালই সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষন। কর্মজীবনের অপরিসীম ব্যবস্তার মধ্যেও যে টুকু অবসর পেতেন তার অধিকাংশ সময়ই সমকালিন গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা প্রবন্ধ পড়ে কাটাতে ভালবাসতেন। অবশ্য পীযূষবাবুর জীবনে নিছক অবসর কতটুকুই বা ছিল? এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে। হয়তো ৬৮ বা ৬৯ সাল, আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। ডাক্তারবাবু চিকিৎসার সাথে সাথে হাওয়া বদলের উপদেশ দিলেন। হঠাৎ একদিন আমাকে অবাক করে দিয়ে পীযূষবাবু বললেন "চল কয়েক দিনের জন্য দীঘা ঘুরে আসি।" আমরা দীঘা চললাম, সঙ্গে বাগবাজারের তরুণ কমরেড অজয় ঘোষ। পথে যেতে যেতে বুঝতে পারলাম 'অধ্যাপক' মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে পার্টির ক্লাস নেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। দীঘাতে সমুদ্র সৈকতে একটি ছোট্ট বাড়ীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। দুটি ঘর, সমুদ্রমুখী একটি ছোট্ট বারান্দা। একটি রান্না ঘর. কিন্তু

রান্নার উপকরণ প্রায় নেই বললেই চলে। একটি হাঁড়ি ও একটি কড়াই, মাপে অন্তত পঞ্চাশ জনের রান্নার উপযোগী। দেখেশুনে আমার তো মাথায় হাত ! যাইহোক কাঠ জ্বালিয়ে উনুন ধরানো হল। সংসার পাততে সময় লাগল না। পরদিন থেকেই অধ্যাপক বেরিয়ে গেলেন মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে। ফিরতেন একদিন কি দুদিন বাদে, সঙ্গে বেশ কয়েকজন স্থানীয় কমরেড। বুঝতাম সবারই ক্ষিদে পেয়েছে তাই আমি আবার তাড়াতাড়ি ভাত বসাতাম, অজয় ছুটত বাজারে। এক এক দিন আমাদের বাড়ীতেই মিটিং বসত। আশপাশের গ্রাম থেকে কমরেড্‌রা আসতেন আমার অসুস্থ শরীরে তাদের আপ্যায়ন করার মত ক্ষমতা ছিল না। বড় অভিমান হত। কিন্তু দোষ দেব কাকে ? তাই সুযোগ পেলেই দুই ছেলে আর অজয় -এর সাথে সমুদ্রের পারে প্রাণভরে আনন্দ করেছি। আজও অজয়ের সেই প্রাণবন্ত উপস্থিতি, মেদিনীপুরের তরুণ কমরেডদের মুখ স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

দীঘা থেকে ফেরার পথে, আমাকে একটু উদাসীন দেখে ট্রেনের কামরাতে 'অধ্যাপক' আমাকে 'বলাকা' আবৃত্তি করে শোনালেন। কারণ বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি, তাই অভিমান ভুলে গল্প শুরু হয়ে গেল। আমাদের জীবনের বহু ছোট বড় সমস্যার এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথ দিয়ে সমাধান হত। মনে পড়ে ৬৭ সালের অসুস্থতার পর প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে বাড়ী ফিরে উনি যখন কঙ্কালসার দেহে শয্যাশায়ী তখন দিনের পর দিন ওনার অভিব্যক্তি হীন মুখ, নিস্পলক চোখ দেখে আমার ভয় হতে লাগল। অবশেষে একদিন দুপুরে 'সঞ্চয়িতা' থেকে ওনাকে পড়ে শোনাতে শুরু করলাম। কিছু ক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম ওঁর হাতের আঙুলগুলো নাড়াতে চেষ্টা করছে। কাছে যেতেই দেখলাম সেই চর্মসার মুখ খানিতে এক আশ্চর্য আনন্দের দ্যুতি। কয়েকদিন বাদে স্বয়ং ডাক্তারবাবুও রোগীর পরিবর্তন দেখে অবাক।

১৯৭১ -এ লোকসভা নির্বাচনে অধ্যাপক দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধেয় পন্ডিত ও প্রবীন সাংসদ অধ্যাপক হীরেন মুখার্জ্জীর বিরুদ্ধে, সি. পি. আই. এম -এর প্রার্থী করা হল। উত্তর-পূর্ব কোলকাতা কেন্দ্রে হীরেনবাবু তখন অপরাজেয়, তার উপর সেবারে তাঁর পিছনে ছিল ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থন। অধ্যাপক মুখার্জ্জী পেলেন ১ লক্ষ ১১ হাজার ভোট, অধ্যাপক দাশগুপ্ত পেলেন ১ লক্ষ ১০ হাজার ভোট। বাড়ী ফিরে বললেন "এবারে জেতাটা জরুরী ছিল, তবে হারটা আমাকে একটা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করল। "আমি অবাক হলাম। উনিই বুঝিয়ে দিলেন, — "জিতলে দিল্লীতে অনেকটা সময় দিতে হত। এদিকে কলেজটা কে দেখত, সেটা ভেবেছ ?" আমি বুঝলাম যে নির্বাচনে পরাজয়টাকে তিনি মনের কোনেও ঠাঁই দিতে চান না। অবশ্য নেতাজীনগর কলেজের বিষয়ে ওনার আবেগ ছিল অনির্বচনীয়। ছুটির দিনেও অন্তত একবার কলেজে না গেলে যেন শান্তি পেতেন না। কলেজকে নিয়ে কত পরিকল্পনা, কত স্বপ্ন প্রতি মুহুর্তে তাঁর চিন্তাকে বিভোর করে রাখত। নতুন "সাইন্স বিল্ডিং, সব্যাধুনিক ল্যাবোরেটরি, খেল্লাধুলার আধুনিক ব্যবস্থা ও সুবিধা, গর্ব করার মত একটি লাইব্রেরী, আরও কত কি ! যখন আবেগভরে বলতেন আমি মুগ্ধ হয়ে থাকতাম। মনে পড়ত সেজদা বলতেন "সমস্ত মহৎ কাজের মূলেই থাকে এক গভীর আবেগ।" কমরেড দাশগুপ্তর আবেগের আর এক অসাধারণ অভিব্যক্তি দেখেছি ওনার বক্তৃতা দেওয়ার মধ্যে। নির্বাচনের সময়ই হোক অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক সমাবেশেই হোক ওনার বক্তৃতায় জটিল

রাজনৈতিক তত্ত্ব, তার বিশ্লেষন এবং প্রাসঙ্গিকতা প্রকাশিত হত সাবলীল সাহিত্যিক ভাষায়, সহজ উপমার সাথে।

৬০ -এর দশকের চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার দিনগুলিতে যখন সুন্দরাইয়া, বাসবপুন্নায়া, নাম্বুদ্রিপাদ, গোপালন প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতারা পশ্চিমবাংলায় জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতে আসতেন, অধ্যাপক দাশগুপ্তকে দেখেছি প্রায় প্রতিটি সভায় তাঁদের বক্তব্যের ইংরাজী থেকে বাংলা তর্জমা করতে। তাৎক্ষনিক অনুবাদের সাথে সাথে ওঁর অপূর্ব শব্দচয়ন এবং বাক্যবিন্যাস বক্তার বক্তব্য এবং আবেগকে অকৃত্রিম ভাবে শ্রোতার মনের গভীরে পৌঁছে দিত। মনে পড়ে ঠিক সেই মুহুর্তে আমিও অগনিত মানুষের মাঝখানে, দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে আর একজন মুগ্ধ শ্রোতা। সভার শেষে ভিড় ঠেলে যখন ওনার কাছে পৌঁছতাম তখন প্রচন্ড আবেগে বলতেন — "আজ সারা ব্রিগেড যেন দাবানলের মত জ্বলছিল। তোমরা দেখেছ ?"

সেই কমরেড পীযূষ দাশগুপ্ত একদিন তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বহিস্কৃত হলেন। এর নিগুঢ় তত্ত্ব আমার অজানা। সেটা ছিল ১৯৭৪ সাল। যদিও বেশ কিছু দিন ধরেই অশনি শংকেতে ঝড়ের পূর্বাভাষ পেয়েছি, কিন্তু দুর্যোগ যখন নেমে এল তার প্রলয়ংকর রূপ দেখে আমি তড়িতাহত, স্তব্ধ। জীবনের চারটি সুবর্ণ দশককে যে মানুষটি হাসিমুখে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মহাযোগ্যে আহুতি দিয়েছেন তাঁকে শুধু ব্রাত্য করেই সেদিনের সে প্রলয় থামেনি। ১৯৭৭ সালে অর্ডিনান্স জারি করে সরকার 'নেতাজীনগর কলেজ' অধিগ্রহন করলেন। প্রায় সাথে সাথেই অধ্যক্ষ পীযূষ দাশগুপ্তর 'সাসপেনশন' ঘোষিত হল। বুঝতে পারলাম যে আজকের দুনিয়ায় মানুষের মহত্তম বিশ্বাসও প্রাতিষ্ঠানিক আশ্বাস বিনা বড় অসহায়। কিন্তু মৃত্যুদন্ডের পরেও আরও কিছু থাকে বাকি ? সে তো শুধু নিথর দেহটা ব্যর্থ আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করা। কোন অপরাধে, কে তাঁকে দন্ড দিয়েছিলেন আমি জানিনা। দন্ডিতের সাথে দন্ডদাতাও সেদিন আঘাত পেয়েছিলেন কি ?, তাও আমার অজানা। শুধু জানি যে, কোনও শাস্তি, কোনও বিদ্রূপ, পীযূষ দাশগুপ্তের মার্কসবাদী বিশ্বাস ও রাবীন্দ্রিক দর্শনে আঘাত হানতে পারেনি। তিনি নির্বাক হয়েছিলেন, নিঃস্ব হননি। অগনিত কমরেড মর্মাহত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বহু নেতৃস্থানীয় মানুষও ছিলেন। অবশেষে কিন্তু তাঁরাও পার্টির এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তবু সেদিন মুহুর্ত্তের জন্যেও তাঁদের চোখে যে প্রতিবাদের আগুন দেখেছি তা অবিস্মরণীয়। অনেকে পারলেও সবাইতো বাধ্য হতে পারেন না। তাই ষাটের দশকের উজ্জ্বল ছাত্রনেতা, ৭০ এ গণশক্তির নিরলস সাংবাদিক, আমার ছোট দেওর বাসবকেও পার্টি বিযুক্ত করল। ইংরাজীর অধ্যাপক, 'পিপ্লস ডেমক্রেসীর এক কর্ণধার, শ্রদ্ধেয় প্রভাস সিংহ পার্টি থেকে ইস্তফা দিলেন। পার্টিতে থাকলে আজ প্রভাসদা নিজগুনেই সসম্মানে ক্ষমতাসীন থাকতেন। কিসের তাড়নায় বা কোন প্রেরণায় সেদিন তিনি ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার বা না দেবার অধিকার একমাত্র প্রভাসদারই। আমি শুধু তাঁকে জানাই আমার অজস্র প্রণাম ও লাল সেলাম।

জীবন থেমে থাকেনি। প্রতিটি দিন কেটেছে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর এক একটি পদক্ষেপের

মত। দেহ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনকে ধীরে ধীরে বিযুক্ত হতে দেখেছি। সেই দিন গুলোয় অধিকাংশ সময়েই অধ্যাপককে নিশ্চুপ থাকতে দেখেছি। আরক্ত নয়ন, মুখমন্ডলে রক্তিম আভা, এমনকি শয্যাও ছিল নিদ্রাহীন, বেদনা উষর। তাঁর স্ত্রী হয়ে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। একদিন ওঁর নিস্তব্ধ মুখখানির দিকে চেয়ে আছি, উনিই জিজ্ঞেস করলেন — "কি দেখছ ?" —"তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে। আমি কি করে সইব, বলতো? " স্মিত হেসে বললেন — "এ কোনও দুর্দৈব নয়। .... আমিতো মার্কসের শঙ্খ মাথায় ধরে রেখেছি। .... আর দেখ সেইটুকু নিয়ে কেমন ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি।"

বস্তুত তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন একথা সঠিক নয়। ওঁর ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক রবি গুহ, ভূপেশ সেনগুপ্ত, মৃনাল সেন প্রমুখ বন্ধুরা ও নেতাজীনগর কলেজের বেশ কয়েকজন অধ্যাপকও সমস্ত প্রতিকূল অবস্থায় ওঁর কাছে আসতেন বা যোগাযোগ রাখতেন। আর অধ্যাপক প্রভাস সিংহ আর আমার দুই দেওর তো সঙ্গে ছিলেনই। তবু ওঁর সারা জীবনের তপস্যা যে রাজনীতি ও অধ্যাপনা সেই দুটি জগৎ থেকেই প্রায় একই সাথে ছিন্নমূল হয়ে অধ্যাপক যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ে আর একজন মানুষের কথা উল্লেখ না করে পারি না। ইনি হলেন তৎকালীন বামফ্রন্টের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী। ৫০ এর দশকে, মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের আন্দোলনের সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মানুষটি একদিন হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। যদিও ছাত্র ছিলেন না তবুও অধ্যাপককে 'মাষ্টার মশাই' বলে সম্বোধন করতেন। বলতেন "যে কোনও প্রয়োজন হলে আমাকে বললেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করব।" ৭০- এর দশকে 'মাষ্টার মশাই' যখন ব্রাত্য, রাম বাবু কিন্তু নিয়মিত ওঁর খোঁজ নিতেন, বাড়ীতেও আসতেন। আমাকে বলেছিলে — "নিজে পড়াশোনার সুযোগ পাইনি তবু মাষ্টার মশাই এর মত মানুষের মূল্য আমি জানি।"

এর মধ্যে আমাদের বড়ছেলে সোহম ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করল আর ছোট ছেলে সপ্তম স্কুলের গন্ডী পার হয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং এ ভর্তি হল। ধীরে ধীরে অধ্যাপক আবার নিজের মধ্যে ফিরে এলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন 'দাস ক্যাপিটাল' বাংলায় অনুবাদ করবেন। কিন্তু কিছুদিন বাদেই কঠিন হেপাটাইটিস -এ মরণাপন্ন হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হলেন। সেদিন আর পার্টি সঙ্গে নেই। কিন্তু শুভার্থীর অভাব হল না। মৃনাল সেনের দাদা শ্রদ্ধেয় শিশিরদা এগিয়ে এলেন। আর সাথে ছিল সোহমের বন্ধুরা। কোনও মতে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হল ডঃ বিনয় ভট্টাচার্যর বাড়ীতে। ৬৮-৬৯ সালে লিভার অ্যাবসেস হওয়ার পর ইনিই অধ্যাপক দাশগুপ্ত আশ্চর্যজনক ভাবে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। এবারে রোগীকে পরীক্ষা করেই তৎক্ষনাৎ হাসপাতালে ভর্ত্তি করার পরামর্শ দিলেন। সোহমকে আশীর্বাদ করে বললেন "এবার বাবাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব তোমার। আমি জানি, তুমি পারবে।" সোহম সফল হয়েছিল। ওর প্রাণের বন্ধু তপন চ্যাটার্জী আর সেই সময়ে পি. জি হস্পিটালের তরুণ ডাক্তার অপূর্ব মুখার্জী ও কুণাল সেণের অক্লান্ত সেবার অধ্যাপক আবার সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলেন।

পি.জি. হস্পাতালের সেই ভয়ঙ্কর টানা-পোড়েনের দিন গুলোয় ওঁকে দেখতে, আত্মীয় স্বজনের বাইরেও আসতো কয়েকজন বন্ধু ও পুরোনো ছাত্ররা। হঠাৎ একদিন উদ্বিগ্ন চেহারায়

উপস্থিত হলেন এক সময়ের উজ্জ্বল ছাত্র নেতা, নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রথম সারির পথিকৃত অসীম চ্যাটার্জী। বহু বছর বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও "পীযূষদার অসুস্থতার সংবাদ ওকে উদ্বিগ্ন করেছিল। চর্মসার শরীরে অধ্যাপক তখন অসুস্থতায় বাকশক্তি রহিত, কিন্তু অসীমকে দেখে ওঁর দু'চোখে এক আনন্দের অভিব্যাক্তি, ফুটে উঠল। শুনেছিলাম ৬০ এর দশকে মতাদর্শের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে এই ভ্রাতৃপ্রতিম কমরেডের সাথে 'পীযূষদার" রাতভোর বহু উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে। অবশেষে বিচ্ছেদ হয়েছিল, গভীর ব্যথায়। আজও মতাদর্শের প্রনিধান ও প্রণয়ন প্রসঙ্গে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা কি কখনও বদলায় ?

হাসপাতাল থেকে ফিরে কয়েক মাসের মধ্যেই প্রকাশক আখতার সাহেবের উৎসাহে 'ক্যাপিটাল' এর অনুবাদ শুরু করলেন। ইতিমধ্যে আমরা নেতাজীনগর ছেড়ে "গল্ফ গ্রীন" -এ একটি ফ্ল্যাটে চলে এসেছি। এই প্রথম, ভাড়ায় নয়, নিজেদের বাড়ী। কিস্তিতে টাকা দিতে হত। দুর্বল শরীরেই উনি আবার সংসারের দায়িত্ব নিলেন, পাশে ছিল সোহম। পঞ্চাশের দশকে পুলিশের হাতে মার খেয়ে, অচৈতন্য অবস্থায় দুদিনেরও বেশী আলিপুর জেল হাসপাতালে ছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে ওঁর ডানহাতে মাঝে মাঝে অসহ্য ব্যথা হত। "ক্যাপিটাল" -এর অনুবাদ করতে বসে সেই ব্যথা আবার ভয়ানক ভাবে উপলব্ধি হল। নিজের হাতে দ্রুত লেখা তখন অসম্ভব। তাই 'ক্যাপিটাল' -এর অনুবাদের সময় প্রায়ই আমাকে অনুলিখনের ভার নিতে হয়েছে। আখতার সাহেবের কাছে শুনেছি 'দাস ক্যাপিটাল' -এর বঙ্গানুবাদের প্রচেষ্টা আগেও হয়েছিল। অথচ ভগ্নাংশও সম্পূর্ন হয়নি। কিন্তু অনুলিখনের সময় অবাক হয়ে দেখতাম, ইংরাজী 'ক্যাপিটাল' সামনে খুলে রেখে, অধ্যাপক, সাবলীল ভঙ্গিতে অনর্গল অনুবাদ করতেন স্বতস্ফূর্ত বাংলায়। কখনও শব্দচয়নে অস্বস্তি দেখলে বুঝতাম শরীর আর সায় দিচ্ছে না। বলতাম, 'আজ এখানেই থাক'। পরদিন আমার দৈনন্দিনের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত উনি অপেক্ষা করে থাকতেন। তারপর আবার শুরু হত অনুবাদ।

প্রায় একই সময়ে সাপ্তাহিক ভাবে উনি 'বর্তমান' পত্রিকায় লিখতেন "অন্যচোখে"। সেই সময়েরই কিছু লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ওঁর "অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ" বইটি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ৭০ এর দশকে সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ' পত্রিকায় 'প্লেখানভ' প্রসঙ্গে অধ্যাপকের ধারাবাহিক লেখাটির কথা। সেই দুর্লভ রচনাগুচ্ছ আজও পুস্তক আকারে প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায়।

অবশেষে একদিন প্রকাশিত হল "দাস ক্যাপিটাল" এর পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ। যতদূর জানি শুধু বাংলায় নয় সেই-ই ছিল কোনও ভারতীয় ভাষায় ক্যাপিটাল -এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। যেদিন টকটকে লাল মলাটের ঝকঝকে প্রথম খন্ডটি বাড়ী তে এল, সেদিন আমাদের সবার মুখেই এক কমরেড সুলভ হাসি।

অবশেষে একদিন সেই প্রলয়ংকর ধূলিঝড় থিতিয়ে পড়ল। নেতাজীনগর কলেজ থেকে কর্মচ্যুতির বিষয়ে তদন্তের জন্য গঠিত ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হল। প্রমানিত হল যে পীযূষ

দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে আনিত সমস্ত অভিযোগই ছিল ভিত্তিহীন, মিথ্যা। সাস্‌পেনশনের দিন থেকে অধ্যক্ষের সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ট্রাইবুনাল কলেজকে নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যে কেটে গেছে প্রায় দুটো যুগ। কে রেখেছে তাঁর পাওনার হিসাব আর কেই বা মেটাতে পারে সেই পাওনা? তবুও সেই ট্রাইবুনালের রায় আমার কাছে এক অমূল্য দলিল। অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর নেওয়ার বয়সও ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে। স্বভাবতঃই কলেজে প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও প্রশ্ন আর ছিল না। কিন্তু ট্রাইবুনালের রায়ের দলিলটি হাতে নিয়ে যখন আপনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, বুঝতে পারতাম, ওঁর মনটা তখন কলেজের স্টাফরুমে, গ্যালারীতে অথবা লাইব্রেরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখমন্ডলে সেই রক্তিম আভার পরিবর্ত্তে এক শান্ত সমাহিত ভাব বিরাজমান।

ক্যাপিটালের' অনুবাদের পর অধ্যাপকের একাধিক মৌলিক রচনার পরিকল্পনা ছিল। আমাদের বড় বৌমা নূপুর তখন পি. এইচ. ডি-র কাজ করছে। ওর ইতিহাসের গবেষণার বিষয়ে অধ্যাপকের সাথে বিস্তর আলোচনা হত। সেই সব আলোচনার সময়ে, কখনও বা ভাই শংকর বা বাসবের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বহুবার ওঁর এই পরিকল্পনার কথা বলেছেন। কিন্তু নিজের শারীরিক কারণেই সেই পরিশ্রম সাধ্য কাজ আর সম্ভব হয়নি। তবুও যে সব গবেষণারত ছাত্র বা অধ্যাপক ওঁর কাছে আসতেন তাঁদের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহায়তা করেছেন। কখনই নিজের বিশ্বাস বা বক্তব্যকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতেন না। বলতেন — "আলোচনার উদ্দেশ্যই হল কোনও বিষয়কে আরও সঠিক ভাবে বোঝা ও বোঝানো। এর মাধ্যমে যে কোনও পক্ষই এক বৃহত্তর সত্যে উপনীত হতে পারে। অন্যের বিশ্বাস, সে রাজনৈতিকই হোক অথবা ধর্মীয়ই হোক, ওনার চোখে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ন। বলতেন, "যাকে সত্য মনে করবে, তাতে পূর্ন বিশ্বাস থাকা অত্যন্ত জরুরী। বিশ্বাসহীনতা অথবা আংশিক বিশ্বাস মনুষ্যত্বের পরিপন্থি।" নিজে প্রকৃত 'নাস্তিক' মানুষ হয়েও আমাকে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা নিতে কোনও বাধা দেননি। ৬০ এর দশকে ওনারই উৎসাহে 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি'র আন্দোলনে যোগ দিই। আবার ৯০ এর দশকে ওঁরই প্রেরণায় 'গল্ফ গ্রীন' এ আমাদের আঞ্চলিক মহিলা সমিতির পত্রিকা 'চিরায়তী' প্রকাশে সফল হই। আমার বিশ্বাস নিয়ে আমিও কখনও ওঁকে বিব্রত করিনি।

ইতিমধ্যে ছোটছেলে সত্তম ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে চাকরী সূত্রে ব্যাঙ্গালোরে সংসার পেতেছে। ছোট বৌমা ঐন্দ্রিলাও সেখানেই গবেষণারত। জীবন বহমান। আমাদের দুই পুত্রের সংসারেই এসেছে দুটি করে নাতি। হঠাৎই 'নিমোনিয়া'য় ভুগে অধ্যাপকের শ্বাস কষ্ট ভয়ঙ্কর রূপ নিল। চারতলার ফ্ল্যাটে ওঠা নামা অসম্ভব হয়ে উঠল। অন্যদিকে ব্যাঙ্গালোরের শিশু দুটি তখন খুবই ছোট, ফলে আমাকে মাঝে মাঝেই সেখানে গিয়ে থাকতে হত। অধ্যাপক থাকতেন কোলকাতায় বড়ছেলের কাছে। অচিরেই মাসাধিক কালের এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের দুঃসহ মনে হতে লাগল। ছেলেরাও আমাদের মনের কথা বুঝত। অবশেষে ছেলেদের সাথে আলোচনা করে অধ্যাপক গল্ফ গ্রীণে'র ফ্ল্যাটটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক করলাম ব্যাঙ্গালোর বা কোলকাতা যেখানেই থাকি দুজনে একসাথেই থাকব।

ইতিমধ্যে পার্টিতেও "নতুন পাতা"র দিন। নবীনেরা নেতৃত্বের দায়িত্বে এসেছেন। ছোট

দেওর বাসবের উদ্যোগেই অধ্যাপকের সাথে আবার তাঁর অনুজপ্রতীম কমরেডদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। তাঁদের আবেগময় আহ্বান পেয়ে অধ্যাপকের চোখেমুখে এক নৈস্বর্গিক অভিব্যক্তি। চিত্ত আনন্দে আকুল তবু হৃদয় বেদনাবিধুর। কমরেডরা নতুন করে দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক বাষ্পাকুল কণ্ঠে ওঁদের বুঝিয়ে বলেছিলেন নিজের শারীরিক দুর্বলতার কথা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল ওঁর বড় প্রিয় একটি রবীন্দ্র সংগীত —

" আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ...."

ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই উনি বহু মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ছোটছেলের বন্ধুরা, কারও কারও বাবা-মাও আসতেন ওনার সাথে গল্প, আলোচনা করতে। 'মেজর জেনারেল পল্' এর সাথে জমে উঠতো নানান আলোচনা। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের বিরাট হাউসিং কমপ্লেক্সের অন্যান্য অল্প পরিচিত মানুষ, এমনকি গেটের দারোয়ান অথবা পরিচারকরা, যারা ওঁর ভাষাও বোঝেন না, তাঁরাও অধ্যাপকের পরম ভক্ত হয়ে পড়লেন। মানুষকে ভালবাসার ও তাঁদের ভালবাসা পাওয়ার কে অনন্য ক্ষমতা ওঁর চিরকালের।

এই প্রসঙ্গে সবশেষে আমার দেখা আর একটি অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা বলি। 'পন্ডিত মশাই' ছিলেন 'মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের এক প্রবীন অধাপক। প্রাচীন পন্থি এই মানুষটির কঠোর রক্ষনশীলতা ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে আলোচনার বিষয় ছিল। কারও হাতের ছোঁওয়া খাবার উনি গ্রহন করতেন না। শুনেছি অবসর গ্রহণের পর হাওড়ায় নিজ বাড়ীতেই থাকতেন, স্বপাক রন্ধন করতেন। ৫০ এর দশকে এক গ্রীষ্মের কাঠফাটা দুপুরে হঠাৎ সেই বৃদ্ধ পন্ডিতমশাই আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত। ক্ষীন দেহের সেই শ্রান্ত মানুষটিকে দেখে আমরা অবাক। ধীরে ধীরে বললেন — "উপলব্ধি করলাম যে সারা জীবন কুসংস্কারাচ্ছন্ন থেকেছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ নিজের সমস্ত কুসংস্কার ভঙ্গ করব। তাই আপনার কাছে এসেছি। আপনার হাত থেকে খাদ্য গ্রহন করে নিজেকে শুচি করতে চাই।" অধ্যাপক দাশগুপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির কথায় সংকুচিত হলেন। বললেন "তার জন্য আপনি এত কষ্ট করে এলেন? আমাকে খবর দিলে, আমিই যেতাম আপনার সেবা করতে....।" পন্ডিতমশাই ওঁকে থামিয়ে দিয়ে আবেগভরা গলায় বললেন — "তোমার মত মানুষ জীবনে একজনকেই পেয়েছি, তাঁকে আর কষ্ট দিতে চাই না।" সেদিনের সেই প্রাচীন সাত্ত্বিক মানুষটির কথা আজও আমার স্মৃতিতে অনুরণিত। আজ চোখের সামনে লেখার অক্ষরগুলি ধীরে ধীরে অশ্রুময় হয় আর বুকের মাঝে জেগে ওঠে এক দুর্মর গর্ব। সেই বিতর্কিত তরুণের মধ্যে কি দেখেছিলেন ঐ প্রাচীন মানুষটি ? আমি জানি।

ইতিমধ্যে এসেছে ২০০০ সাল। বয়স বাড়লেও পৃথিবী দূরত্বে ছোট হয়ে এসেছে। দেশ দেশান্তর আমাদের টেলিফোনের বোতামে। তবু কোলকাতা যেন বহুদূর। তাই মাঝে মাঝে

দুজনে কোলকাতায় চলে আসতাম! কখনও বা বড় ছেলে সপরিবারে চলে আসতো ব্যাঙ্গালোরে। আজকের বিদ্যুতগতি পৃথিবীর ব্যতিব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে, সমস্ত কাজ ফেলে, যখনই পুরো পরিবারটা এক জায়গায় হত, তখনই যেন শুরু হত এক উৎসব। শেষবার যখন দুজনে মিলে কোলকাতায় যাই, সেটা ছিল ২০০২ এর গ্রীষ্মের ছুটি। আত্মীয়, অনাত্মীয় বহু কমরেডের সাথে আবার দেখা। নতুন সহস্রাব্দের কোলকাতাকেও দেখলাম। ছোট দেওর বাসব নিয়ে গেল 'মিলেনিয়াম পার্ক-এ", সদ্য সংস্কার হওয়া 'টাউন হল'-এ। দুর্বল শরীরেও বহুক্ষণ ধরে অধ্যাপক 'টাউন হল'-এ সংরক্ষিত প্রতিটি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য নিরীক্ষণ করে খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন। কোলকাতায়, সোহমের বাড়ীতে, তখন প্রতিদিনই অধ্যাপকের কাছে আত্মীয়, বন্ধু, ছাত্র ও পুরোনো কমরেডদের ভীড়। এছাড়া শংকর বাসব, দুই ভাইতো ছিলই। একদিন প্রভাসদা এলেন। বহুক্ষণ গল্প হল। সমস্ত কিছুর ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা চললো টেলিফোনেও। বাল্যবন্ধু মৃণাল সেনের সাথেও একদিন বহুক্ষণ ধরে ফোনে গল্প করলেন। ফিরে আসার আগে আমরা দেখে এলাম বড় বৌমা, নুপুরের পরিচালনায় এক রবীন্দ্র সন্ধ্যা। দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি যে সেটাই আমাদের শেষবারের মত একসাথে কোলকাতায় যাওয়া।

অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্তর সাথে প্রায় পঞ্চাশ বছর সংসার করেছি। সেই অসাধারণ যাত্রাপথের প্রতিটি পদক্ষেপ উপলব্ধি করেছি -- জীবন এগিয়ে চলে,— "নব নব পূর্বাচলে, আলোকে, আলোকে" তাই আজ আমাদের শিকড় পূর্ববঙ্গের মফস্বঃল টাউন থেকে কোলকাতা হয়ে দেশের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। যখন যেখানে যতটুকু রস আস্বাদন করতে পেরেছি সেই মাটিই আমাকে ঋণী করেছে। অধ্যাপকের জীবনের মাত্র শেষ কয়েকটি বছর কেটেছে ব্যাঙ্গালোরে। সেই দিন গুলোও আমার কাছে অমূল্য। ছোট ছেলে সত্তমের একনিষ্ঠ যত্ন, ছোট বৌমা পিউ-এর (ওর ডাকনাম) এর প্রাণোচ্ছল ভালবাসা মনে কোনও অতৃপ্তির স্থান রাখেনি। মাঝে মাঝে যখন সোহম কোলকাতা থেকে সপরিবারে আসতো তখন তো আর কথাই নেই। আর একজন অতি অন্তর্মুখী মানুষ ওঁর জীবনের ব্রাত্য অধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সাথী হয়েছিলেন। তিনি হলেন আমার আর এক দাদা (দাদামণি), যাকে অধ্যাপক ডাকনামে 'কানু' বলে ডাকতেন। সেই কানু, ক্ষিতিন্দ্র চৌধূরী, বহুদিন আগেই প্রথাগত দৈনন্দিন জীবনের আকর্ষণ ত্যাগ করে "বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের" সেচ্ছাসেবী হয়েছেন। মিশনের কাজের পর অবসর পেলেই তার প্রিয় "পীযূষ"এর সাথে সময় কাটাতেন। সেই একই আকর্ষনে ব্যাঙ্গালোরেও এসেছেন বেশ কয়েকবার।

২০০২ এর আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে 'দাদামণি" হঠাৎ ব্যাঙ্গালোরে এলেন। কয়েকদিন ধরেই অধ্যাপক আমার কাছে প্রায়ই তাঁর দুই ভাই -এর গল্প করছিলেন। নিজের ভাই না হলেও 'দাদামণিকে' কাছে পেয়ে বেশ খুশী হলেন। শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। রোজই ডাক্তার দেখানোর কথায় 'আজ না কাল' করে কাটাচ্ছিলেন। একদিন রাত্রে স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র জহর সেন কলকাতা থেকে ফোন করলেন। দুর্বল শরীর, তবু বেশ কিছুক্ষণ ধরেই কথা হল। পরদিন সকালে ওঁকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে গেলাম। গাড়ীতে উঠতে উঠতে 'দাদামনিকে বললেন কানু, অপেক্ষা কর, আমি আসছি। কিন্তু আর ফিরে আসেন নি। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করেই

হাসপাতালে ভর্ত্তির নির্দেশ দিলেন। সত্তম ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পৌছলাম। দুপুরের দিকে জানা গলে অবস্থা গুরুতর। উনি তারই মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট ভাবেই আমার সাথে কথা বলছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন সোহম খবর পেয়েছে কিনা। মনিপাল হাসপাতালে চিকিৎসার কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেই অমোঘ মুহুর্ত্তটি ঘনিয়ে এল। সজ্ঞানেই এক অদ্ভুত প্রশান্ত চিত্তে তিনি সম্পূর্ন নির্লিপ্ত হলেন। এবার আর ওঁর উপর রাগ করতে পারিনি। সমস্ত ভালবাসা, সকল শ্রদ্ধা তখন দূর্বার অশ্রুধারায়। ওঁকে প্রণাম করলাম। পরদিন, ১৩ই আগষ্ট, সকাল থেকেই 'ব্যাঙ্গালোরে' আমাদের বাড়ীতে প্রায় কয়েকশো মানুষের ভীড়। পুষ্পস্তবকে, মালায় তাঁরা ভরিয়ে দিলেন প্রয়াত অধ্যাপককে। সংগ্রামী জীবনের দীর্ঘ দূর্গম পথের শেষে অধ্যাপক চলে গেলেন পুষ্পিত রথে।

সোহম ওর বাবার অস্থি সযত্নে কোলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। আরিয়ালখা নদীর পারের মানুষটির দেহাবশেষ অর্পন করেছিল ভাগিরথীর জলে। শুনেছি সেদিন গঙ্গায় তখন পূর্ণ জোয়ার। এমন এক সন্তানকে কাছে ফিরে পেয়ে নদীও কি গর্বে আত্মহারা ?

অসংখ্য বন্ধু, কমরেড, ছাত্র ও অনুরাগীদের কাছে তাঁদের এই প্রিয় মানুষটি পরিচিত ছিলেন বহু সম্বোধনে। পীযূষবাবু, পীযূষদা, অধ্যাপক দাশগুপ্ত, মাষ্টারমশাই বা কখনও শুধুই পি.জি। এই অজস্র মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সম্পৃক্ত। আর যাঁরা সংগ্রামী জীবনের দীর্ঘ পথে ওঁকে কখনও ভুল বুঝেছেন, এমনকি আঘাতও হেনেছেন, তাঁদের জন্যও পীযূষ দাশগুপ্তর করুণাঘন দরদের ডালি কখনও রিক্ত হয়নি। তাই চিরকালই বড় আবেগময় গলায় আবৃত্তি করতেন —

"........ মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।"



সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সাথে
ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর দফতরে

বাবার কথা

— সোহম দাশগুপ্ত

ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে শুনতাম আমার বাবার ছেলে বেলার গল্প। মাদারিপুরে, পদ্মার শাখা, আড়িয়ালখাঁর পারে দামাল ছেলে পীযূষের বড় হওয়ার গল্প। সেই গল্পগুচ্ছ, আজও যে কোন রূপকথার থেকে আমার বেশী প্রিয়। আমার একান্ত নিজের "ঠাকুরমার ঝুলি"। শুনতে শুনতে কল্পনায় যে দৃশ্যগুলো রচনা করতাম সেগুলো আজও আড়িয়ালখাঁর স্রোতের মতই স্মৃতিকে মুখর করে রেখেছে।

গভীর রাত, সবাই ঘুমন্ত, কিশোর পীযূষ নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে পৌঁছে যেত নদীর ঘাটে। তারপর খেয়া ঘাট থেকে মাঝিদের নৌকা খুলে নিয়ে মাঝ নদীতে। জোৎস্না রাতে সেই দামাল নদীতে নৌকা বাওয়া তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। দাঁড় টানতে টানতে সে ধরত তার প্রিয় গান —

"চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে, উছলে পড়ে আলো........."।

সেই সময়, অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতর। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসতে পীযূষের দেরি হয়নি। ফলে অচিরেই তার উপরে দায়িত্ব পড়ল কংগ্রেস ভবনের ছাদে তিরঙ্গা পতাকা ওড়াবার। এমন কাজের ভার পেয়ে সে তখন আত্মহারা। বৃটিশ পুলিশের পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে, গাছ বেয়ে, কার্নিস হয়ে একেবারে স্কুলের ছাদে। পদ্মার হাওয়ায়, মাদারিপুরের আকাশে উড়ল তিরঙ্গা, পীযূষ চিৎকার করে ঘোষনা করল বন্দেমাতরম। এবার পুলিশের তাড়া। পালাতে গিয়ে হাত ভাঙ্গল 'আমার' পীযূষের। বলতে বলতে ঠাকুমার কণ্ঠস্বর ভরে উঠত গর্বে আর আমার কল্পনায় তখন এক রাজপুত্র, 'রাঙা ঘোড়ার পরে' টগবগিয়ে চলেছে আড়িয়ালখাঁর পারে।

৬৪ সাল, আমি তখন স্কটিশচার্চ স্কুলের ক্লাস ফোর-এ, বাড়ী বদল করে দমদম থেকে সবে আমরা বাগবাজারে। একদিন মধ্যরাতে হঠাৎ একটা ফোন এল। ঘুম চোখে উঠে দেখি মার সাথে নীচুস্বরে কথা বলতে বলতে বাবা পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিলেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে। মা তখন দরজায় দাঁড়িয়ে, নিথর, তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল। আমার পাশে ঘুমন্ত আমার তিন বছরের ভাই।

বেলা দশটা নাগাদ বাবা ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে মা একটা ঝোলায় বাবার কিছু জামাকাপড় গুছিয়ে রেখেছিলেন। বাবা দু'একটি বই ঝোলায় ভরলেন তারপর আমাদের দুই ভাই এর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন "শুভ, তুমি চিন্তা কোরোনা, ওরা তো তোমার কাছেই রইল, আমি যোগাযোগ রাখব।" মা'র মুখে কথা নেই, দরজার কাছে বাবাকে প্রণাম করলেন। আমি দেখলাম তাঁর চোখে আর জল নেই। বাবা চলে গেল, আমার চোখের সামনে, "রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে।" আমার ছোট ভাই, আমার অভিমানী ভাই, সে তখন মুঠিতে মায়ের আঁচলটি ধরে স্থির, নিস্তব্ধ।

আমার কৈশোরে অনেকটা সময়েই বাবা থাকতো বাড়ীর বাইরে, পার্টির কাজে, কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে। আমার নেশা তখন গল্পের বই-এ। আর সেখানেই নিয়মিত বাবার দেখা, মার্কটোয়েনে, শরৎচন্দ্রে, গোর্কিতে, রবীন্দ্রনাথে। রোমাঞ্চ হত। আরও বেশী রোমাঞ্চিত হতাম, যখন আবিষ্কার করতাম যে সে বইগুলির অধিকাংশই বাবার ছাত্রজীবনে পুরস্কার হিসাবে পাওয়া।

৬০ এর দশকের গোড়ায়, বে-আইনী কমিউনিষ্ট পার্টি, বাবা আত্মগোপনে। সারা বাংলায় উত্তাল গণ আন্দোলন, প্রতিদিন কাগজে শহীদের ছবি আর সন্ধ্যায় কার্ফিউ। এমনই এক রাত্রে "যখন পশ্চিম দিগন্তে প্রদোষকাল ঝঞ্ঝা বাতাসে রুদ্ধশ্বাস", দূর থেকে ভেসে আসছে মুহুর্মুহু বন্দুকের গর্জন আর আমার মা, এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠে কখনও আমাদের জড়িয়ে ধরছে, কখনও বা বিছানায় আছড়ে পড়ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বিশ্বাসে, সেই রাজপুত্র ছুটে চলেছে, সেই রাঙা ঘোড়ায় ভাগিরথীর পারে পারে।

পরে জেনেছি, সেই সময়ে, যখন পার্টি বে-আইনী, অধিকাংশ নেতা ও কর্মীরা জেলে, তখন সারা বাংলাব্যাপী সেই ঐতিহাসিক আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত করেছিলেন, আত্মগোপনকারী তিন যোদ্ধা, শ্রদ্ধেয় সমর মুখার্জী, বিপ্লবী গণেশ ঘোষ এবং আমার বাবা।

ঠিক এই মুহূর্তে, স্বল্প পরিসরে, আমার মায়ের কিছু কথা না বললে, বাবার কথাও অসম্পূর্ন থেকে যায়। বাবা আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার কয়েকদিনের মধ্যেই মা সাউথ সিঁথির নবজাতক বিদ্যালয়ে চাকরী নিলেন। দুই দুরন্ত ছেলে, দৈনন্দিন সংসার এবং স্কুলের দায়িত্ব সামলে মা রাত্রে পড়াশোনা শুরু করলেন, অনার্স পরীক্ষার জন্য। মা অনার্স পেলেন, কিন্তু হারালেন তাঁর স্বাস্থ্য। রোজ জ্বর আসতো। স্কুলে ক্লাসের ফাঁকে বেঞ্চে শুয়ে থাকতেন। চেঁচিয়ে পড়াতে গেলে কাশি উঠতো। একদিন রাত্রে কাশির শব্দে ঘুম থেকে উঠে দেখি, ঘরে আলো জ্বলছে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মা কাশছে আর সেই আঁচল বেয়ে রক্ত। পরদিন সকালে আরও অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের সাথে মাও প্রস্তুত, তারপর যে যার স্কুলের পথে। এই ভাবেই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শরীরটা যখন ভিতর থেকে ক্ষয়ে চলেছে, মা কিন্তু তাঁর মনটাকে অটুট রেখেছিলো। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল আমাদের বহু শুভাকাঙ্খীর নিঃস্বার্থ সহমর্মিতায় এবং "শুভর" নিঃসীম সহধর্মিতায়।

৬৭ তে বিধানসভা নির্বাচন, পীযূষ দাশগুপ্ত, কাশীপুর কেন্দ্রে, সি.পি.আই.এম. এর মনোনীত প্রার্থী। ময়দানে ময়দানে মিটিং, পথে-পথে মিছিল, দেয়ালে-দেয়ালে পোষ্টার, দরজায়-দরজায় প্রচার আর মনে মনে উত্তেজনা। ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে ভোটদান শেষ হল। অবশেষে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পর খবর এলো, ১০০০ ভোটে পীযূষ দাশগুপ্ত পরাজিত। সমস্ত অঞ্চল স্তব্ধ, কারও চোখে জল, কারও বা অবিশ্বাস। এমন সময় এক মূক মিছিলের পুরোভাগে সেই দৃপ্ত ভঙ্গী, সেই উজ্জ্বল মুখ —

আমার অপরাজেয় রাজপুত্র ঘরে ফিরলো। বাড়ীতে ফিরেই বাবা তাঁর স্তব্ধ অনুগামীদের দিকে তাকিয়ে বললেন — "আপনাদের মুখে এই হতাশা শোভা পায় না। আমরা, যারা আগামী দিনের কথা বলি, বিশ্বাস করি যে, বিপ্লবই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ, তাদের উচিৎ নতুন উৎসাহে আবার কাজ শুরু করা, কাল থেকে নয়, আজই এবং এখনই।" সামান্য কয়েকটি কথা, কিন্তু কি অসামান্য প্রত্যয় সবাইকে মুহূর্তে সম্বিত ফিরিয়ে দিল। যেন রাজপুত্রের হাতে সোনার কাঠি - রূপার কাঠির কাহিনী।

৬৯ সাল, ইতিমধ্যে বাবা সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে, দু'মাস হাসপাতালে তারপর প্রায় এক বছর বাড়ীর বিছানায় কাটিয়ে সবে সুস্থ হয়েছেন। এরই মাঝে ঘটে গেছে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকাল পতন। তখন আসন্ন ৬৯ এর মধ্যবর্ত্তী নির্বাচন।

খবর এলো, নিছক শারীরিক কারণেই এবার পীযূষবাবুকে প্রার্থী করা হবে না ; কাশীপুর থেকে মনোনয়ন পেলেন কমরেড কে. জি. বোস, তৎকালীন সরকারী কর্মচারী সংগঠনের অন্যতম নেতা। যতদূর শুনেছি, বাবার স্বাস্থের কথা ভেবেই তাঁকে ঐ গুরু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। পার্টির এই সিদ্ধান্ত বাবা মেনে নিলেও মানতে পারেননি বাগবাজার, শোভাবাজার, রাজবল্লভপাড়ার অধিকাংশ কমরেডরা। তাঁরা দল বেঁধে জড়ো হলেন আমাদের বাড়ীতে, জানালেন, যে আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা সংগঠনে বা প্রচারে অংশ নিতে নারাজ। সেই বক্তব্য শুনতে শুনতে বাবা গম্ভীর হলেন, তাঁদের কথা শেষ হতে না হতেই বললেন, "আপনারা যদি সত্যিই আমাকে আপনাদের যোগ্য সাথী হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে এই মুহুর্ত্তে সব অভিমান ভুলে ফিরে যান যে, যার এলাকায়। মনে রাখবেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য শ্রেণী হীন সমাজ আর সীমানা হীন পৃথিবী। মাঝখানে বহু দুর্গম পথ ও দুর্লভ্য সোপান। এ পথের শেষ পদক্ষেপ পর্যন্ত যদি আপনাদের সাথে পাই সেটাই হবে আমার পূর্ন সার্থকতা। এই মুহূর্তে আমাদের কর্ত্তব্য আগামী নির্বাচনে কমরেড কে.জি. বোস কে জয়ী করা। আসুন আমরা গত নির্বাচনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করি।"

এই ঘটনার দু'এক দিনের মধ্যেই জানলাম বাবাকে কমরেড কে. জি. বোসের মুখ্য নির্বাচনী সংগঠকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে এ দায়িত্ব কতটা লঘু ছিল আমি জানিনা, কিন্তু বাবা জীবনে কোনও দায়িত্বকেই লঘুভাবে গ্রহণ করেন নি।

কে.জি.বোস নির্বাচনে জয়লাভ করলেন। কাশীপুর কেন্দ্রে সেই প্রথম একজন সি.পি.আই.এম. প্রার্থী জয়ী হলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বের চরম শক্তিমান দেশ হিসাবে আমেরিকার পাশে সোভিয়েত ও চীন সুপ্রতিষ্ঠিত, শুধু পরাক্রমে নয় অহমিকাতেও। দুনিয়ার অন্য দেশগুলোতে মার্কসবাদের বিকাশ, বিস্তার ও বাস্তবায়নের প্রসঙ্গে মস্কো ও বেজিং এর মত তখন সম্পূর্ন ভিন্ন ; ফলে বাকি দেশের কমিউনিষ্টদের মধ্যে তীক্ষ্ণ মেরু বিভাজন এবং সেই সূত্রেই ৬০ এর দশকে দু-দুবার ভাঙলো ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। সাথী হল শত্রু ; তাদের আদর্শের অসন্তোষ, অসহিষ্ণু পথে অবিশ্বাসকে

হাতিয়ার করে আত্মহননের আয়নায় মুখোমুখি।

১৯৬৯ সাল, আমার জীবনে সেই প্রথম বাবাকে উদ্বিগ্ন, অস্থির হতে দেখেছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত কখনও বা রাতভোর, গোপন আলোচনায় কাটিয়ে বাবা ফিরতেন। কোনদিন মুখে হাসি নিয়ে কোন দিন বুকে ব্যথা নিয়ে। ৬৮ সালের সেই মারাত্মক অসুস্থতার পর বাবার এই অক্লান্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দেখে মার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গলো। একদিন রাগ করে বললেন, "এই অত্যাচার শরীর সইবে ? যারা নকশালদের সাথে যাচ্ছে তাদের ফেরানোর দায় কি তোমার একার ?" বাবা মুহূর্তে উত্তেজিত হলেন, গম্ভীর গলায় বললেন, "দায় আমাদের সবার। কিন্তু ভুলে যেওনা যে আমি, সেই আমাদেরই একজন। আর জেনে রাখ ওদের ফিরিয়ে আনা আমার শুধু দায় নয়, একান্ত দায়িত্ব। এবার মাও গম্ভীর হলে, "জানি, কিন্তু তুমিকি জানো, যে সবাই এটা ভাল চোখে দেখছে না? অনেকে তোমাকেই সন্দেহ করছে।" এবার বাবা নিরস্ত্র। উদাস মুখে মলিন হাসি, বললেন —

"গোঁড়া রাম ভাবে নাস্তিক আমি

পাতিরাম ভাবে কনফুসি,

স্বরাজীরা ভাবে নারাজী

নারাজীরা ভাবে, তাহাদের অঙ্কুশি.......... ।"

আড়িয়ানথার মুখ আমি দেখি নাই, গঙ্গার মুখ আমি দেখিয়াছি। তাই বাগবাজার ছিল আমার তপোবন, আমার মাদারিপুর, যেখানে হাত বাড়ালেই বন্ধু আর ডাক দিলেই কমরেড, মিছিলে মিছিলে গণসঙ্গীত আর সভায় সভায় 'দিন বদলের পালা।" সেই বাগবাজার ছেড়ে আসতে হল। ৬৯ এর শেষ দিকে বাবা সদ্যোজাত নেতাজী নগর কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পেলেন। তখন কলেজ বসত সন্ধ্যায়, নেতাজীনগর স্কুল বাড়ীতে। বাবার দুর্বল স্বাস্থ্যে রোজ বাগবাজার - টালিগঞ্জ করা সম্ভব ছিল না। বড় ব্যথায় বাগবাজার ছেড়ে আমরা টালিগঞ্জের বাসিন্দা হলাম।

এলো ৭০ এর দশক, ঘটনার ঘনঘটা নিয়ে। প্রথমেই লেনিন জন্ম শতবর্ষ, জেলায় জেলায় সভা আর অনুষ্ঠান। আমি তখন পড়াশোনা ফেলে ছায়ার মত বাবার সাথে। অনুষ্ঠানের পর গভীর রাত পর্যন্ত বাবার সাথে জেলার নেতাদের আলোচনা চলত। একদিন বুঝতে পারলাম যে নেতৃত্বের সাথে বাবার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। সে এক ভয়ঙ্কর উপলব্ধি, শিরায় উপশিরায়, মস্তিষ্কের কোষে কোষে এক হিমেল প্রবাহ।

এলো ৭২ সাল, দিনটা সম্ভবত ২৭শে মার্চ। "এলো মানুষ ধরার দল, গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে"। কমরেডরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাধ্য হলেন ঘর ছেড়ে পালাতে। কিন্তু বাবা নেতাজীনগর ছাড়তে নারাজ। আলীমুদ্দিন থেকে ফোন আসছে, বাবার ওপর

আক্রমণের আশঙ্কায়। বাবা কিছুতেই তাঁর কলেজ আর এলাকার মানুষদের ছেড়ে গেলেন না। আমরা নেতাজীনগরেই রইলাম, এক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে, সুদিনের অপেক্ষায়।

আমার কাছে "একজন প্রিয় অধ্যাপক', "একজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবি", "একজন রাজনৈতিক নেতা" এরকম বহু পরিচয়ের আড়ালে বাবার আসল পরিচয়টা ছিল "একজন সাচ্চা মানুষ"। আমি জানতাম সেটাই ছিল বাবার চরিত্রের সমস্ত শক্তির বৃহত্তম উৎস এবং তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ের দুর্বলতম স্থান। আর সেই কারণেই তিনি ছিলেন এমন বেপরোয়া ভাবে আদর্শবাদী। দান প্রার্থীর হাতে নিজের কবজ কুন্ডল তুলে দিতে তাঁর বুক কখনও কাঁপেনি। আমি জানতাম আমার রাজপুত্রের একমাত্র বাসনা —

"জয়লোভে, যশোলোভে রাজ্যলোভে, আয়ি,

বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

আর সেই কারণেই ৭২এ দুর্জনের আক্রমন তাঁকে শঙ্কিত করতে পারেনি, কিন্তু ৭৪-এ স্বজনের আঘাত তাঁকে রক্তাক্ত করেছিল। তাঁর রাজনৈতিক নির্বাসনের দীর্ঘ্য বছরগুলির দিন পঞ্জীর প্রতিটি পাতায় পাতায় সেই রক্তের দাগ, আর বুকের মাঝে রবীন্দ্রনাথ —

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,

সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া।

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,

যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,.....।

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা।"

আজ বাবা আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বাসের বীজমন্ত্র তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রোথিত করে গেছেন, আমাদের মনের মনিকোঠায় তা নিত্য নীরবে উচ্চারিত।